Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# খোলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাকিবুল ইসলাম রাজন

রোলঃ 23100110086


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## খোলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ রাকিবুল ইসলাম রাজন

রোলঃ 23100110086

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " খোলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ রাকিবুল ইসলাম রাজন, আইডিঃ 23100110086 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " খোলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Rakib

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**মোঃ রাকিবুল ইসলাম রাজন**

আইডিঃ 23100110086

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


ভূমিকাঃ ..... 5

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ..... 6

খলিফার গুণাবলী ..... 8

খলিফা নির্ধারণের পদ্ধতি ..... 15

খলিফা নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কারা? ..... 16

খেলাফতে রাশেদা ..... 18

আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবন ও কর্ম ..... 22

হযরত উমর রাঃ এর যুগ ..... 45

হযরত উসমান রাঃ এর খিলাফত ..... 61

হযরত আলি রাঃ এর খিলাফত ..... 77

খিলাফতে রাশেদার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ..... 96

শেষ কথা ..... 110

# ভূমিকাঃ

খিলাফাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব। একজনের পর অন্যজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়াকে খিলাফাহ বলে। পারিভাষিক অর্থ খিলাফাহ হলো- মুসলিমদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা, শরিয়া অনুসারে শাসন কার্য পরিচালনা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

আর তিনিই যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলিফা করেছেন।সূরা আল-আনআম:**১৬৫**

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ

আর স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে নূহের কওমের পর স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) করলেন।সূরা আল-আ'রাফ: ৬৯

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে জমিনে প্রতিনিধি করেছি।সূরা ছোয়াদ: ২৬

মদীনায় হিজরতের পরেই যখন মুসলমানরা সবদিক থেকে শত্রুবেষ্টিত ছিলেন, একদিকে মক্কাবাসীরা মদীনায় এসে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য নিজেদের অস্ত্র শাণিত করছিল, অন্যদিকে স্বয়ং মদীনার য়াহূদ ও মুনাফিকরা মুসলমানদের ফাঁসাতে নতুন নতুন জাল পাতছিল, তখন আল্লাহ তাআলা এই দুশ্চিন্তার ভিড়ের মধ্যেই তাদের সান্ত্বনা দান করলেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ

করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক। সূরা আন-নূর-৫৫

আল্লাহর এ ওয়াদা অতি শীঘ্র বাস্তবায়িত হয়েছিল। হিজরতের দশ বছর পরেই এ মজলুম অসহায় নিঃস্ব মুসলমানরাই পুরো আরব উপদ্বীপে ঐশী প্রশাসনের পতাকা স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা একদিকে পারস্যরাজের ক্ষমতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করছিলেন, অন্যদিকে রোম সম্রাটের শক্তির সাথে মোকাবেলায় লিপ্ত ছিলেন।

অতএব, 'ইসলামী খেলাফত' যুগের প্রথম খলীফা ছিলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং দ্বিতীয় খলীফা, যিনি রসূলের প্রথম খলীফা হবার গৌরব লাভ করেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)। কিন্ত যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে 'খলীফা' শব্দটি রসূলুল্লাহর খলীফা অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে কারণে প্রথম খলীফা হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-ই গণ্য হয়ে থাকেন।

## খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

আলিমদের ইজমা অনুসারে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। এ-বিষয়ে সাহাবি ও তাবিয়িদেরও ইজমা রয়েছে। ইবনু হাযম আন্দালুসী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন-আহলুস সুন্নাহ, শিয়া, খাওয়ারিজ সকলের মতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা বা খলিফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব।

ইবনু খালদুন লিখেছেন-সাহাবি ও তাবিয়িদের ইজমা অনুসারে ইমাম নির্ধারণ ওয়াজিব। এজন্যই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবিরা দ্রুত হযরত আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নির্ধারণ করেন। প্রতি যুগেই এমনটি হয়েছে। কোনো যুগেই মুসলিমরা খলিফা নির্ধারণ করা ব্যতীত থাকেনি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় খলিফা নির্ধারণ ইজমা-সম্মতভাবেই ওয়াজিব বা আবশ্যক।

খলিফা নির্ধারণের আবশ্যকতা কুরআনের একটি আয়াত থেকেও বুঝে আসে। সূরা নিসার ৫৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।
এ আয়াতে আল্লাহ ও রসূলের আদেশ মানার পর 'উলুল আমর'-এর আদেশ মানার কথা বলা হয়েছে। উলুল আমরের ব্যাখ্যায় আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তারা হলো শাসক।" যদি শাসকই নির্ধারণ করা না থাকে তাহলে শাসকের আদেশ মানার কথা আসবে কেন? এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শাসকের আদেশ মানা যেমন আবশ্যক, শাসক নির্ধারণ করাও তেমন আবশ্যক।

এই কথাটিই ইবনু হাজার হাইতামী রহিমাহুল্লাহ এভাবে বলেছেন- 'সাহাবায়ে কেরাম একমত ছিলেন যে, নবুওয়াতের যুগ শেষ হওয়ার পর ইমাম নির্ধারণ ওয়াজিব। তারা এটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেছেন; এমনকি নবীজির দাফনেরও আগে এই কাজে ব্যস্ত হয়েছেন।'

খিলাফাহর আবশ্যকতা না বুঝলে এর জরুরত বোঝা যাবে না। যদি এক বাক্যে কেউ খিলাফাহর আবশ্যকতা জানতে চায়, তাহলে ইমাম নাসাফীর কথাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-'মুসলিমদের জন্য একজন ইমাম আবশ্যক যিনি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবেন, হদ (শাস্তি) কার্যকর করবেন, সীমান্তকে নিরাপদ রাখবেন, সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করবেন, যাকাত গ্রহণ করবেন, চোর-ডাকাত ও অপরাধীদের দমন করবেন, জুমা ও ঈদের নামাজ কায়েম করবেন, মানুষের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করবেন, মানুষের অধিকারের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, অভিভাবকহীন নারী-পুরুষের বিয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং গনিমাত বণ্টন করবেন'।”

খিলাফাহ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ইজমা থাকলেও এ ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে কীভাবে, তা নিয়ে দ্বিমত আছে। উম্মাতের জমহুর আলিমদের মতে এ ওয়াজিবশারয়ীভাবেই

সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন এটি সাব্যস্ত হয়েছে আকলের মাধ্যমে। দ্বিতীয় দলের মতে, সামাজিক জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই মানুষ ইমাম বা খলিফা নির্ধারণের বিষয়টি আবশ্যক করে তুলেছে। কিন্তু ইবনু খালদুন স্পষ্ট লিখেছেন, 'খিলাফাহর যৌক্তিকতা প্রমাণের বিষয়টি পুরোপুরি শরীয়াহকেন্দ্রিক। এখানে আকলের কোনো দখল নেই। আকলের মাধ্যমে একে প্রমাণের চেষ্টাও যৌক্তিক নয়।'"

মুতাযিলাদের কেউ কেউ অবশ্য মত দিয়েছেন, ইমাম বা খলিফা নির্ধারণ ওয়াজিব নয়। তবে তাদের এ মত এতটাই অগ্রাহ্য যে, এর জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেননি কেউ।

এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান ইমাম মাওয়ারদী এভাবে লিখেছেন-'জিহাদ ও ইলম শিক্ষার মতো ইমাম নির্ধারণও ফরজে কিফায়াহ। যখন সমাজের কেউ তা আদায় করে নেয়, সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়।'

## খলিফার গুণাবলী

খলিফা নির্বাচনের জন্যও নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলি উল্লেখ করেছেন ফকিহগণ। ইমাম মাওয়ারদীও এ-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

১. মুসলিম হওয়া

এটি প্রথম আবশ্যিক শর্ত। কোনো অমুসলিম কখনো মুসলিমদের শাসক হতে পারবে না। বিষয়টি সরাসরি কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণিত।

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরিক করা মস্ত বড়ো জুলুম।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা শিরক কে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ, সকল মুশরিকই জালিম।

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِينَ.

তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট যে, অমুসলিমরা মুসলিমদের শাসক হতে পারবে না। স্বাভাবিক আকল অনুসারেও এটি অবাস্তব কল্পনা যে, একটি রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কোনো অমুসলিমকে দেওয়া হবে।

২. সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

এটিও স্বাভাবিক। যে বালেগ হয়নি সে শাসনকার্য পরিচালনার চাপ নিতে পারবে না। এই কাজের গুরুত্ব ও ভার সম্পর্কেও সে থাকবে অসচেতন। একইসাথে মানসিকভাবেও থাকতে হবে সুস্থ। মানসিক সুস্থতার দিকটিকে মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হলো, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা; যেমন-পাগল হয়ে যাওয়া কিংবা মানসিক ভারসাম্য হারানো। এক্ষেত্রে তাকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। আগে থেকে দায়িত্বে থাকলে অপসারণ করতে হবে। আর যদি সমস্যাটি সাময়িক হয়; যেমন পেরেশানি বা চিন্তায় থাকা, তাহলে অপসারণ করা হবে না। এবং তাকে ক্ষমতায় বসাতেও কোনো বাধা নেই।

৩. পুরুষ হওয়া

কোনো মহিলার জন্য শাসনকার্য পরিচালনা বৈধ নয়। এর পক্ষে দলিল হলো, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন-
'ওই জাতি কখনো সফল হবে না, যারা নিজেদের শাসনভার কোনো নারীর হাতে অর্পণ করে।'
হাদিসটি নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন তখন, যখন মদিনায় সংবাদ এসেছিল পারস্যের লোকেরা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে নিজেদের শাসক নিযুক্ত করেছে। এছাড়া অন্য একটি হাদিসেও নবীজি নারী- নেতৃত্বের বিষয়টি নাকচ করে বলেন-

‘যখন তোমাদের আমির হবে তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক, তোমাদের ধনীরা হবে দানশীল এবং তোমাদের কাজকর্ম পরিচালিত হবে মাশোয়ারার মাধ্যমে, তখন মাটির নিচ থেকে ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম। আর যখন তোমাদের আমির হবে বাজে লোকেরা, তোমাদের ধনীরা হবে কৃপণ আর তোমাদের শাসনকার্য থাকবে মহিলাদের হাতে, তখন জমিনের ওপর থেকে জমিনের নিচই হবে তোমাদের জন্য উত্তম।’

৪. কুরাইশী হওয়া

খলিফার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, তিনি কুরাইশী হবেন। এ-বিষয়ে দলিল হলো নবীজির হাদিস-যেখানে তিনি বলেছেন, '(খিলাফাতের) বিষয়টি (নির্ধারণ) হবে কুরাইশদের মধ্য থেকে, এমনকি যতক্ষণ কুরাইশদের অন্তত দুজন জীবিত থাকে। '

অন্য হাদিসে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'খিলাফাতের বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে।' আরেকটি হাদিসে তিনি বলেন, 'সকলমানুষ কুরাইশদের অনুসারী। যারা মুসলিম তারা মুসলিম সদস্যদের অনুসারী। যারা কাফির তারা কাফিরদের অনুসারী।

আরেক হাদিসে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ ভালো ও মন্দ দুই বিষয়েই কুরাইশদের অনুসারী।’

এ হাদিসগুলো সামনে রেখে আলিমদের বড়ো অংশ মনে করেন, খলিফার জন্য কুরাইশী হওয়া শর্ত। কাজী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ স্পষ্ট লিখেছেন, 'মুতাযিলা ও খাওয়ারিজ বাদে আর কেউ এই শর্তের সাথে দ্বিমত করেনি।' কিন্তু ইমাম মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহর মতে, শর্তটি সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং, এতে আলিমদের ইখতিলাফ আছে। ইবনু হাজার আসকালানীও ফাতহুল বারীতে অনুরূপ কথাই বলেছেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর মতে, ইমাম আবু হানিফা কুরাইশী হওয়াকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেননি। ইমামুল হারামাইন জুয়াইনীও কুরাইশী হওয়াকে সর্বজনীন শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেননি। ইবনু খালদুনের মতও এমন।

কাজী আবু বকর বাকিল্লানী অবশ্য কুরাইশী হওয়াকে জরুরি শর্ত মনে করেন। ইবনু হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার মতে, হযরত উমার রদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশী হওয়াকে জরুরি শর্ত মনে করতেন না। কারণ, মুসনাদু আহমাদের সহিহ বর্ণনা থেকে জানা যায়, মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন- 'যদি আজ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জীবিত থাকতেন তাহলে তাকে আমি খলিফা বানাতাম। অথবা যদি মুআয বিন জাবাল জীবিত থাকতেন তাহলে তাকে আমি খলিফা বানাতাম।' আবু উবাইদা ইবনুলজাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু যদিও কুরাইশী ছিলেন, কিন্তু মুআয ইবনু জাবাল কুরাইশী ছিলেন না।

আরেকটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন-'যদি আজ আবু হুযাইফার আজাদকৃত দাস সালিম জীবিত থাকত, তাহলে তাকে আমি খলিফা বানাতাম।'সালিম রদিয়াল্লাহু আনহুও কিন্তু কুরাইশী ছিলেন না।

এ-বিষয়ে আলিমদের নানা ধরনের মতগুলো সামনে রাখলে যা বোঝা যায় তা হলো, কুরাইশী হওয়া জরুরি শর্ত তখনই, যখন তার মধ্যে অন্য শর্তগুলো পাওয়া যাবে। যদি কারও মধ্যে অন্যান্য শর্ত না পাওয়া যায়, কিন্তু সে কুরাইশী হয়, সেক্ষেত্রে তাকে খলিফা বানানো হবে না। আরেকটি বিষয় হলো, যখন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তখন কুরাইশী হওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে দেখা হবে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে কোনো অকুরাইশী এই পদে চলে আসেন, তাহলে তাকে শুধু এই কারণে অপসারণ করা হবে না।

তবে, জরুরি জ্ঞাতব্য হলো, কুরাইশী হওয়ার শর্তটি শুধু খলিফার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি খলিফা কাউকে কোনো অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন, তাহলো তার কুরাইশী হওয়া জরুরি নয়।

৫. ইলম থাকা

ইসলামী সিয়াসাত বিষয়ে আলিমদের যারাই কলম ধরেছেন তারা সকলেই একমত যে, আমির বা খলিফার জন্য ইলম জরুরি। এখন ইলমের মাপকাঠি কী হবে? ঠিক কতটুকু

ইলম থাকা জরুরি, এ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। ইমাম মাওয়ারদীর মতে খলিফাকে অবশ্যই ইজতিহাদের যোগ্য হতে হবে। ইমামুল হারামাইন জুয়াইনীও এ মত গ্রহণ করেছেন।কলকাশান্দী রহিমাহুল্লাহও লিখেছেন, 'ইমামের জন্য ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।'

যেহেতু খলিফাকে সমসাময়িক অনেক বিষয়ে দ্বীনি জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে, ফলে তার ইজতিহাদ ও মাসআলা ইস্তিম্বাত করার গুণ বা যোগ্যতা থাকা জরুরি। অবশ্য পরবর্তী ফকিহদের অনেকেই এ শর্তকে কিছুটা শিথিলযোগ্য বলেছেন। তবে মুজতাহিদ না হলেও একজন বিজ্ঞ ফকিহ হওয়া আবশ্যক। নয়তো ফিকহুন নাওয়াযিল (সমসাময়িক মাসআলা) সম্পর্কে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না। ইমামুল হারামাইন জুয়াইনীর মতে, 'কোনো মাসআলায় যদি ইমাম নিজে ভালো জ্ঞান না রাখেন, তাহলে তিনি বিজ্ঞ আলিমদের সাহায্য নেবেন।'

আধুনিক সময় অনুসারে আমরা বলতে পারি, ইমাম একই সাথে ইসলামী শরীয়াহ ও আধুনিক রাজনীতি সম্পর্কে গভীর জানাশোনার অধিকারী হবেন। যে-কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান করার যোগ্যতা তার থাকতে হবে। একইসাথে তাকে সাহায্য করার জন্য আলিমদের একটি বোর্ড থাকা আবশ্যক, যারা ফিকহুন নাওয়াযিল বা আধুনিক সমস্যাগুলোর শারয়ী সমাধান দেবেন।

৬. আদিল হওয়া

ইমামের জন্য জরুরি শর্ত হলো, তিনি আদিল হবেন। আদিলের সংজ্ঞা ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। আদিলের অর্থ হলো-তিনি নিজের জীবনে শরীয়াতের বিধিবিধান মেনে চলবেন এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবেন। এই শর্তের কারণে কোনো প্রকাশ্য পাপাচারী ও জালিম মুসলিমদের শাসক হতে পারবে না। যদি কখনো কোনো খলিফার মধ্যে এই ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে অপসারণ করা আবশ্যক। ইমাম আবু হানিফার মতে, 'আদিলের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থাই বিবেচ্য হবে। যদি কাউকে বাহ্যিকভাবে নেককার পাওয়া যায়, তাহলে তার ব্যাপারে আর তত্ত্বতালাশ করা দরকার নেই। তার গোপন গুনাহ আছে কি না তা অনুসন্ধানের দরকার নেই।' কিন্তু

সাহিবাইনের মতে, 'খলিফা হওয়ারজন্য নিছক বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা করা যথেষ্ট নয়। তার অভ্যন্তরীণ হালতের ব্যাপারেও খবর নিতে হবে।' হানাফী ফকিহগণ সাহিবাইনের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

তবে সমকালীন আলিমদের অনেকেই মনে করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই শর্ত নিয়ে অতিরিক্ত কঠোরতার দরকার নেই। এখানে কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। আধুনিক ফকিহদের কেউ কেউ মনে করেন, 'বর্তমান সময় অনুসারে আদিলের সংজ্ঞা হবে, যার নেক কাজ খারাপ কাজের চেয়ে এগিয়ে যাবে সে-ই আদিল।' তাদের মতে, 'কোনো কাজী যদি হকের পক্ষে ফয়সালা করেন এবং কোনো শাসক যদি নিজেকে জুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলেই তিনি আদিল হিসেবে গণ্য হবেন।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানী এ-বিষয়ে সুন্দর একটি সমাধান দিয়েছেন। তার মতে, 'যখন খলিফাকে নির্বাচন করা হবে তখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের ওপর আবশ্যক হলো তারা সবগুলো শর্ত যাচাই করবেন। আদিলের প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তি তালাশ করবেন। কারও মধ্যে যদি সবগুলো শর্ত ও আদিলের প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী আদালত পাওয়া যায়, তাহলে তার উপস্থিতিতে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেবেন না। কিন্তু যদি প্রথম সংজ্ঞা অনুসারে কাউকে না পাওয়া যায়, কিংবা ঘটনাক্রমে এমন কেউ শাসক হিসেবে মসনদে বসে যায়, যার মধ্যে আদালতের ঘাটতি আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আদিলের দ্বিতীয় সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।' শাসকের জন্য আদিল হওয়া খুবই জরুরি। আল্লামা শাইজারী লিখেছেন, 'শাসকদের জন্য সবচেয়ে উত্তম গুণ হলো আদল। এর বিনিময়ে তার শাসন সুসংহত হয়। আদলের মাধ্যমেই লোকদের আনুগত্য মজবুত হয়, সম্পদের মাঝে বরকত আসে।' আদল সম্পর্কে ইবনু কুতাইবা চমৎকারএকটি প্রবাদ উল্লেখ করেছেন। প্রবাদটি হলো- 'জনগণ ছাড়া কোনো শাসক হয় না। সম্পদ ছাড়া জনগণ একত্র হয় না। বসতি ছাড়া সম্পদের সংগ্রহ ও বিন্যাস সম্ভব হয় না। আর আদল ও সুষ্ঠু রাজনীতি ছাড়া কোনো বসতি টেকে না।

আল্লামা আরমাবী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন- 'যে শাসক আদলের সাথে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন, জনগণের ওপর জুলুম করেন না, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন এবং জনগণ তার আনুগ্যত্য মেনে নেয়। তার জন্য নিয়ামাতের দরজাগুলো খুলে যায়, জীবন

শান্তিময় হয়ে ওঠে। জনগণ এমন শাসকের আনুগত্য করা ফরজ ধরে নেয়। তাদেরকে দমনের জন্য কোনো বাহিনী করারও দরকার হয় না।'"

৭. শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তি থাকা

ইমাম মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহর মতে ইমামের জন্য আবশ্যক হলো-'তার দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তি সুস্থ থাকবে।' স্বাভাবিক বিবেচনায়ও এ শর্তগুলো জরুরি। শ্রবণশক্তি না থাকলে তিনি জরুরি বিষয়গুলো শুনতে পারবেন না। দৃষ্টিশক্তি না থাকলে জরুরি নথিপত্র তিনি না দেখেই স্বাক্ষর দিতে হবে। বাকশক্তি না থাকলে তিনি মুখে কোনো আদেশ দিতে পারবেন না। লিখে দিতে হবে, সেখানে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে।

কলকাশান্দী রহিমাহুল্লাহও লিখেছেন, অন্ধ ব্যক্তিকে ইমাম বানানো যাবে না। তবে কারও যদি রাতকানা রোগ থাকে তাহলে তাকে ইমাম বানাতে সমস্যা নেই।' বধির ব্যক্তির ক্ষেত্রেও কলকাশান্দী একই মত অনুসরণ করেন। তিনি লিখেছেন, 'বধিরকে কাজীও নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

কলকাশান্দী অবশ্য শরীরের অন্যান্য অঙ্গের সুস্থতাকেও শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন-তার মতে হাত-পা নেই, বা কিছু অংশ কাটা এমন লোককে ইমাম বানানো যাবে না। শাফিয়ী মাযহাবের আলিমদের মতও অনুরূপ।

৮. সাহসিকতা

কলকাশান্দী ইমামের জন্য সাহসিকতাকেও শর্ত করেছেন। তার মতে, শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সাহসিকতা জরুরি। সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করা, বিভিন্ন শহর ও দুর্গ জয় করা এবং শত্রুদের নির্মূলের জন্য ইমামকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। যদি তিনি সাহসী না হন, তাহলে তিনি এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবেন না।

৯. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা

কলকাশান্দীর মতে ইমামকে অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সক্ষম হতে হবে। কারণ, দারুল ইসলামের সকল বিষয় তার সামনেই পেশ করা হবে। সব বিবেচনা করে তাকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত দিতে হবে। ফলে দুর্বল সিদ্ধান্তের অধিকারী কিংবা তাড়াহুড়াপ্রবণ কাউকে এ দায়িত্বে বসানো যাবে না। তিনি নিজের দুর্বলতা ও তাড়াহুড়ার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে দারুল ইসলামের সর্বনাশ করে ছাড়বেন।

## খলিফা নির্ধারণের পদ্ধতি

সাধারণভাবে ইমাম বা খলিফা নির্ধারণের পদ্ধতি দুটি।

১. খলিফা জীবিত থাকতেই তার পরের খলিফা নির্ধারণ করে যাবেন-যেমনটা হযরত আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন, হযরত উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে খলিফার ইন্তিকালের পর পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ নিয়ে বাড়তি কোনো চাপ থাকে না। শুধু জনগণের হাত থেকে বাইআত নিলেই কাজ শেষ হয়ে যায়।

২. যদি খলিফা তার পরের খলিফা নির্ধারণ করে না যান-যেমনটা করেছিলেন হযরত উমার রদিয়াল্লাহু আনহু; কিংবা কোনো কারণে এক খলিফাকে অপসারণ করে আরেকজন খলিফাকে নিয়োগের প্রশ্ন আসে, তাহলে এক্ষেত্রে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খলিফাকে নির্বাচিত করা হবে।

## খলিফা নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কারা?

খিলাফাহর অস্তিত্বের সাথে জড়িত খলিফার বিষয়টি। একটিকে ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। খিলাফাহ যেহেতু ওয়াজিব তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, খলিফা কে হবেন? তার কী কী যোগ্যতা থাকা দরকার? কোন কোন গুণের মাধ্যমে তাকে নির্বাচিত করা হবে। তাকে কারা নির্বাচন করবেন? তাদের মাঝে কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? খলিফা নির্বাচনের আগে খলিফাকে নির্বাচিত করবেন কারা, তাদের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার।

প্রায় সকল আলিম ও ফকিহ বলেছেন, ইমাম বা খলিফা নির্ধারণের দায়িত্বটি 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তথা মজলিসে শুরার ওপর ন্যস্ত। তারা যাকে নির্বাচন করবেন তিনিই মুসলিমদের আমির হবেন। এখানে অবশ্য বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সদস্য কতজন হবেন? আমির নির্বাচনের জন্য তাদের কত জনের মতামত জরুরি? সবার সমর্থন লাগবে নাকি নির্দিষ্ট সংখ্যক সমর্থন পেলেই ইমাম নির্বাচন করা যাবে?-এ প্রশ্নগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ইমাম মাওয়ারদীর মতে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সদস্য হতে হলে নিম্নের গুণগুলো থাকতে হবে।

১. প্রথমত তারা আদিল হবেন

আদিলের ব্যাখ্যায় শাইখ আবদুল কাদির আওদাহ লিখেছেন-এর অর্থ হলো, তার মাঝে গুনাহ ও দোষত্রুটি মুক্ত থেকে ফারায়েজ ও ফাজায়েল আদায়ে সচেষ্ট থাকার গুণটি উপস্থিত থাকবে। এককথায় এর অর্থ হলো, একজন আদিল ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে কথায়, কাজে ও আকিদায় দ্বীনের ওপর অটল থাকবেন। অন্য কথায় বলা যায়, তিনি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের জন্য প্রথম জরুরি শর্ত। প্রতিটি সদস্যের মধ্যেই এই শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে। মূলত আদালতের গুণটি এমন

যে, প্রতিটি কাজেই এটি আবশ্যক। ইতিহাসের নির্মোহ পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় মুত্তাকিরাই শাসন ও প্রজাদের কল্যাণচিন্তার অধিক হকদার। তাদের কাছেই জনগণের স্বার্থ আমানাত ও নিরাপদ। মুত্তাকিদের বিপরীতে গুনাহগার, পাপাচারীরা যখন শাসনক্ষমতার বিষয়ে নাক গলায়, তখন তারা ডেকে আনে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা। সুতরাং, শুরার সদস্য যিনি হবেন তিনি প্রতারক হতে পারবেন না। যদি তার দ্বারা প্রতারণার কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলে তিনি এই দায়িত্বের জন্য বিবেচিত হবেন না।

২. তার মধ্যে ইলম থাকতে হবে।

বিশেষ করে খলিফা নির্বাচন-সংক্রান্ত ইলম। যা থেকে তিনি বুঝতে পারেন, কাকে নির্বাচিত করা যায় আর কাকে করা যায় না। কাকে নির্বাচিত করলে জনগণের অধিক কল্যাণ হবে আর কাকে করলে অকল্যাণ ডেকে আনা হবে। অবশ্যই তাদের শরীয়াহর বিধিবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। সাথে থাকতে হবে হালাল-হারামের জ্ঞান। ইলম বলতে এখানে দ্বীনি ও জাগতিক দুই ধরনের জ্ঞানই উদ্দেশ্য। শারয়ী জ্ঞান থাকার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতি, জিওপলিটিক্যাল মুভমেন্ট, রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে শুরার কোনো সদস্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। একজন আমির বা খলিফা নির্বাচনের জন্য অবশ্যই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত জানাশোনা থাকতে হবে, যার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

এমনকি সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেও বোঝা যায়-শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা শারয়ী ইলমের চেয়ে সিয়াসাত বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। যেমন হযরত উমার রদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস ও মুগিরা ইবনু শুবা রদিয়াল্লাহু আনহুমকে বিভিন্ন এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ, সে-সকল এলাকায় তাদের চেয়ে বড়ো আলিম সাহাবিও উপস্থিত ছিলেন। যেমন, কুফায় অবস্থান করছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু। আবু দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু অবস্থান করছিলেন সিরিয়ায়। এ থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রপরিচালনা-সংক্রান্ত ইস্যুতে গভীর ইলমের অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে ইলমের পাশাপাশি সিয়াসাত বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিমকে প্রাধান্য দেওয়া জরুরি।

৩. প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুণ।

এটিও একটি জরুরি বিষয়। অনেক সময় আদালত ও ইলম একত্রিত হলেও এর সাথে থাকে না প্রজ্ঞার সমন্বয়। ফলে যোগ্য ব্যক্তিও অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তদিয়ে বসেন। এজন্য প্রথম দুটি গুণ মিলে গেলে দেখতে হবে তার মাঝে প্রজ্ঞা আছে কি না। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত তিনি দিতে পারেন কি না। তিনি কি সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় নির্মোহ থাকেন, নাকি পরিবেশ-পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

মজলিসে শুরার সদস্যদের জন্য এই গুণাবলি অর্জন করা আবশ্যক। কারণ, খলিফা নির্বাচনের বিষয়টির সাথে পুরো উম্মাহর স্বার্থ জড়িত। এখানে ভুল হলে পুরো বিষয়টিই এলোমেলো হয়ে যাবে। আদিল শাসকের পরিবর্তে জালিম শাসকের চাবুক চেপে বসবে জনগণের পিঠে।

সাদুদ্দীন তাফতাযানী রহিমাহুল্লাহ আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের বিষয়ে স্পষ্ট লিখেছেন- 'তারা হবেন আলিম ও মানুষের মাঝে নেতৃস্থানীয়।'

শুরার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা ইমাম মাওয়ারদী শর্ত আকারে উল্লেখ না করলেও অন্য আলিমরা উল্লেখ করেছেন। তা হলো, শুরার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য খলিফার নিজ অঞ্চলের ওপর বাইরের অঞ্চলের লোককে প্রাধান্য দেওয়া হবে না। কারণ, যিনি সেই এলাকায় থাকেন, তিনি সে-সম্পর্কে অধিক অবগত হয়ে থাকেন।

## খেলাফতে রাশেদা

ইসলামী প্রশাসন যদি সঠিক অর্থে আল্লাহ মনোনীত প্রশাসন হয়, ইসলামের বিধানসমূহের প্রচলন, শরীয়তী দণ্ডসমূহ কার্যকর, দ্বীনের মূলনীতিসমূহের প্রচার, শরীয়তের বিদ্যাসমূহের প্রসার, বিবাদ মীমাংসা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ রাসূল (সঃ) এর আদর্শ মোতাবেক হয়, এর বিধি ব্যবস্থা শূরার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রধান নবুওয়াতসত্তা (সঃ) এর ব্যাপকতা ধারণ করেন, তিনি হন দরসের

আসনে স্বাধীন মুজতাহিদ, ইরশাদের মজলিসে অলীয়ে কামেল, বিচারের এজলাসে ন্যায়বিচারক এবং যুদ্ধের ময়দানে সাহসী সেনানায়ক, মোটকথা, ধর্ম ও রাজনীতির সকল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুণাবলীতে তিনি হন রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঠিক প্রতিনিধি- তাহলে এরূপ খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বা 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওওয়াত' বলা হয়।

চার খলীফা- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত উমর ফারূক (রাঃ), হযরত উসমান গনি (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পয়গম্বরসুলভ জীবন পদ্ধতি এবং তাঁদের খেলাফতকালের গৌরবময় কীর্তিকলাপের উপর একবার দৃষ্টিপাত করলে এই বাস্তবতা আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যায় যে, তাঁদের খেলাফতকালই খেলাফতে রাশেদার কাল ছিল। রসূল আকরাম (সঃ) এর একটি হাদীস রয়েছে -

الخلافة بعدى ثلاثون عاما ثم ملك بعد ذلك খেলাফত আমার পর ত্রিশ বছর, তারপর রাজত্ব।

এ হাদীসে খেলাফত বলতে পূর্ণাংগ খেলাফত বা খেলাফতে রাশেদা উদ্দেশ্য। খেলাফতে রাশেদা মূলতঃ নবুওয়াত যুগের পরিশিষ্ট ও সমাপ্তি।

## বনু সায়েদার বৈঠকখানা

মহানবী (সঃ) এর ইন্তেকালের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলমানদের সামনে এই ছিল যে, তাঁরা কোন মহান ব্যক্তিকে মহানবী (সঃ) এর খলীফা নির্বাচন করবেন। তাছাড়া জরুরী ছিল, এই কাজটি যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করে ফেলা। নইলে এই আশংকা ছিল যে, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের ঐক্য, যা এ পবিত্র দ্বীনের ভিত্তি, তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং ইসলামের গৌরবময় ভবন, যা নির্মাণে নবী করীম (সঃ) এর জীবনের তেইশটি বছর খরচ হয়েছে তা জমিনের সাথে মিশে যাবে।

এ সময়ের মুসলমানদের প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়- মুহাজির ও আনসার। যে সব মুসলমান নিজেদের দেশ, আত্মীয় স্বজন এবং ধনসম্পদ পরিত্যাগ করে মক্কা

মুয়াজ্জমা থেকে মদীনায় চলে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুহাজির। অপরপক্ষে যাঁরা নিজেদের জান ও মালের বিনিময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে সাহায্য করেছিলেন এবং নিজেদের দেশ মদীনায় আহ্বান করে দ্বীনের আলোকবর্তিকা সমুজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন আনসার। বনূ সায়েদার বৈঠকখানা ছিল আনসার নেতা সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর বৈঠকখানা। আনসারদের নেতৃবৃন্দ বনু সায়েদার বৈঠকখানায় একত্রিত হলো এবং খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতে লাগলো। প্রথমে সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়ালেন। তিনি আনসারদের দ্বীনসেবার উল্লেখ করলেন এবং তারপর বললেন, রাসূল প্রতিনিধিত্বের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত আমরাই। কতিপয় আনসার বললেন, আপনি সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন।

সমাবেশ থেকে এক আওয়াজ এলো- যদি মুহাজিরগণ না মানেন এবং রাসূলে আকরাম (সঃ) এর আত্মীয়তার কারণে নিজেদের দাবী উত্থাপন করেন তাহলে কি হবে? আরেক জন জবাব দিল, "তাহলে আমাদের বংশের একজন আমীর হবেন এবং তাঁদের বংশের একজন হবেন।" হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এ সমাবেশের কথা জানতে পারলেন। তখন তাঁরা মুহাজিরদের সহযোগে সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত উমর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে থামিয়ে দিলেন এবং নিজেই অত্যন্ত দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের সাথে এক বক্তৃতা দিলেন।
এ বক্তৃতায় তিনি প্রথমে মুহাজিরদের দ্বীনি ত্যাগের কথা উল্লেখ করলেন।

অতঃপর আনসারদের ত্যাগী মনোবৃত্তির অন্তর খুলে প্রশংসা করলেন অতঃপর বললেন, যদি মাহাত্ম্য ও গুণাবলী দেখা হয়, তাহলে দুদলের কেউ অন্যের চেয়ে কম নয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "ইমাম কুরাইশদের মধ্য থেকে হবেন"।

অতএব, হে আনসার সম্প্রদায়। খলীফাগণ আমাদের মধ্য থেকে হবেন এবং উজিরগণ (সাহায্যকারীগণ) আপনাদের মধ্য থেকে হবেন। আপনারা বিশ্বাস করুন যে, খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

আনসারদের খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো, আচ্ছা, মুহাজিরদের যদি আমাদের খলীফা হওয়াতে অসম্মতি থাকে তাহলে একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হোন আরেক জন তাদের মধ্য থেকে।

স্পষ্টতঃই এ মত ছিল নিতান্ত ভুল। সেজন্য হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত কঠোরভাবে এর প্রতিবাদ করলেন। অতঃপর হযরত আবু উবায়দা ইবনুেল জাররাহ (রাঃ) বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়। আপনারাই প্রথমে ইসলামকে শক্তি দান করেছেন। এখন আপনারাই তাঁর দুর্বলতার ব্যবস্থা করবেন না। এ কথা শুনে খাযরাজ গোত্রেরই অপর ব্যক্তি হযরত বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন:

হে আনসার সম্প্রদায়! আমরা যদি ইসলামের সেবায় অংশ গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর রসূল পাকের আনুগত্যের খাতিরে করেছি। এতে কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের কোন অবকাশ আছে কি এবং তার বিনিময়ে পার্থিব সম্পদ কামনা করা কতটুকু সমীচীন? শুনুন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ বংশের ছিলেন। কুরাইশ বংশ তাঁর প্রতিনিধিত্বের অধিক উপযুক্ত। আল্লাহর শপথ, এই পদের ব্যাপারে আমি তাঁদের সাথে বিবাদ করা মোটেই সমীচীন মনে করি না। আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁদের বিরোধিতা করবেন না।

আনসারদের মধ্য থেকেই যখন একটি দল কুরাইশদের সমর্থক হয়ে গেল, তখন তাঁরা নীরব হয়ে গেলেন। এখন এ বিষয় তো সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, কুরাইশদের মধ্য থেকেই খলীফা হবেন। তবে এ পর্যায়টি অবশিষ্ট ছিল যে, কে হবেন তিনি? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন- ভাইয়েরা, উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আবূ উবায়দা ইবনুেল জাররাহ-এর মধ্য থেকে যে কোন একজনে খলীফা হওয়া উচিত। আপনারা যাঁকে উপযুক্ত মনে করেন তাঁকে নির্বাচন করুন।” এ কথা শুনে তাঁরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একবাক্যে বললেন- হে সিদ্দীক! বেশ তো, আপনি থাকতে আমরা এমন সাহস দেখাতে পারি? আপনি মুহাজিরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ছওর গুহার নির্জনে রসূলে খোদার সাথী, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশায় নামাজের ইমামতিতে আপনি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, অথচ ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ। এ সকল মাহাত্ম্য

থাকতে রসূলের খলীফা হবার জন্য আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে হতে পারে? আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমরাই প্রথমে বায়আত করি। "কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) হাত বাড়ালেন না। হযরত উমর (রাঃ) দেখলেন যে, যদি হযরত আবু বকর (রাঃ) অসম্মত হন তাহলে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। তাই তিনি নিজেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহান সিদ্দীকের হাতে বায়আত করে নিলেন। এরপর সকল মুসলমান বায়আত করার জন্য ভেঙ্গে পড়ল। এভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উত্তমভাবে ও স্বাচ্ছন্দে মীমাংসিত হয়ে গেল এবং মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাফন দাফনে লিপ্ত হলেন।

## আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবন ও কর্ম

জন্ম ও আসল নাম:

আবু বকর (রা)-এর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ। 'আবু বকর' ছিল মূলত তার ডাকনাম। তিনি নবীজি (সা)-এর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিলেন এবং খুব সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে তার জন্ম হয়।

দেখতে কেমন ছিলেন?

শারীরিকভাবে তিনি বেশ হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন। গায়ের রং ছিল ফর্সা এবং দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। তার কপাল ছিল প্রশস্ত আর তিনি সবসময় দাড়ি-চুলে মেহেদি লাগাতেন। হাঁটার সময় তিনি কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতেন, যা ছিল তার অন্যতম শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

বিখ্যাত কিছু উপাধি:

আস-সিদ্দিক: মিরাজের ঘটনা শোনামাত্র বিশ্বাস করায় নবীজি তাকে এই উপাধি দেন।

আল-আতীক: অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।

আস-সাহিব: কোরআনে আল্লাহ তাকে নবীজির 'সঙ্গী' হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন।

আল-আতক্বা: যার অর্থ প্রচণ্ড খোদাভীরু।

আল-আওয়্যাহ: খুব নরম মনের মানুষ এবং দয়ালু হওয়ার কারণে তাকে এই নামে ডাকা হতো।

পরিবার-পরিজন:

তার বাবা আবু কুহাফা এবং মা উম্মুল খায়ের-উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর (রা) চারজন স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার মোট ৬ জন সন্তান ছিল (৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে)।

**আবু বকর রাঃ এর কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য-**

বীরত্ব

আবু বকর (রা) এর বিশেষ গুণের কথা বলতে গেলে প্রথমে আসবে তাঁর বীরত্ব এবং সাহস।

হযরত আলী (রা) বলেন, বদরের দিনে আমরা রাসুলুল্লাহ (সা) এর জন্য একটি ছাউনি বানিয়েছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হযরত নবী করীম (সা) এর কাছে কে থাকবে? তাঁর উপর মুশরিকদের হামলা কে প্রতিহত করবে? আল্লাহর কসম! আমাদের মধ্যে কেউ সাহস করলো না। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক উলঙ্গ তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাউকে তাঁর কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। যে ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর হামলা করেছে আবু বকর (রা) তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

একবার মক্কায় মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর গলা চেপে ধরে। কারো সাহস হলোনা সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বাঁচানোর জন্য। তখন আবু বকর (রা) তিনি সেখানে দৌড়ে চলে যান রাসূলুল্লাহ (সা) কে বাঁচাতে যার কারণে তাঁকে এত মারা হয়েছিলো যে আহত-রক্তাক্ত হয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এমন নানা ঘটনায় আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর মোহাব্বতে অসম্ভব সাহসিকতা এবং বীরত্বের পরিচয় দেখিয়েছিলেন।

দানশীলতা-

তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

لَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

অর্থঃ "আর তা (জাহান্নাম) থেকে বহুদূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য (৯২: ১৭-১৮)।

আবু বকর (রা) একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তার সবটাই নবী করীম (সা) এর খেদমতে এবং ইসলামের খেদমতে ব্যয় করে দেন। এজন্য হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আমি সবার অনুগ্রহ পরিশোধ করেছি, কিন্তু আবু বকর (রা)- এর অনুগ্রহ অবশিষ্ট রয়েছে। তার বিনিময় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দেবেন। আবু বকর (রা) এর সম্পদ দ্বারা আমার যতখানি উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা ততখানি হয়নি"। এমনকি উসমান (রা) যে এত দান করেছেন উনার ব্যাপারেও এভাবে বলেননি যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকর (রা) এর কথা বলেছেন।

জ্ঞান-বুদ্ধি:

জ্ঞান-বুদ্ধিতে তিনি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তীক্ষ্ণ ও মেধাবী ছিলেন। কোন ব্যাপারে যখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ হতো, তখন তারা সে বিষয়টি আবু বকর (রা)-এর সামনে উপস্থাপন করতেন। আবু বকর (রা) তাদেরকে সেটার সমাধান দিতেন। তাঁর খেলাফত আমলে তিনি বড় বড় সাহাবিদেরকে নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করেছিলেন। যে কোন মাসআলা-মাসায়িল এবং বিচারকার্যের ক্ষেত্রে এই বোর্ড এর সিদ্ধান্ত ছাড়া তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিতেন না। বিশেষভাবে যে শাস্ত্রে আবু বকর (রা) খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন সেটা বংশগতিবিদ্যা। তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে অনেক জ্যান রাখতেন। এমনকি জুবায়ের বিন মুতঈম- যিনি আরবের অন্যতম নসববিদ বা বংশবিদ বলে পরিচিত ছিলেন, তিনিও আবু বকর (রা) এর ছাত্র ছিলেন এবং আবু বকর (রা) এর কাছে বংশ সংক্রান্ত জ্ঞান নিতে আসতেন। এজন্য রাসূল (সা) যখন মিনার তাবুতে যেয়ে আরবের বাইরের গোত্রগুলোকে দাওয়াত দিতো তখন তিনি আবু বকর (রা) কে নিয়ে যেতেন। কেননা প্রতিটা গোত্রের ব্যাপারে আবু বকর (রা) এর পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা ছিলো। তাই তাদেরকে দাওয়াতের ব্যাপারে তাদের বংশানুক্রম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকর (রা) থেকে জেনে নিতেন।

স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূলের পর আবু বকর (রা) হলেন স্বপ্নের সবচেয়ে বড় বর্ণনাকারী। কিন্তু এটা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং ইউসুফ (আ) এই ২ জন ছিলেন একমাত্র সঠিক স্বপ্নের বর্ণনাকারী। তবে, আবু বকর (রা) প্রায়ই স্বপ্নের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতেন এবং তাঁর ইজতিহাদ সঠিক হয়ে যেতো।

সামাজিকতা:

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা- আতা ইবন সাইব (র) বলেন, খিলাফতের বায়'আত গ্রহণের পরদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) দুটি চাদর নিয়ে বাজারে রওয়ানা হন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, বাজারে। হযরত উমর (রা) বললেন, এখন আপনি এই ধান্দা ছেড়ে দিন। আপনি মুসলমানদের আমীর হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তাহলে আমি ও আমার পরিবার-পরিজন কি খাবে? হযরত উমর (রা) বললেন, এ কাজটি হযরত আবু

উবায়দাকে সাপের্দ করুন। তারপর দু'জনই হযরত আবু উবায়দা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাকে হযরত আবু বকর (রা) বললেন যে, আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের খরচপত্র মুহাজিরদের নিকট থেকে আদায় করে দাও। সব জিনিসই সাধারণ মানের হতে হবে। গ্রীষ্ম ও শীতের পাশোকেরও প্রয়াজেন হবে। ছিড়ে গেলে আমি তা জমা দেবাে এবং নতুন পাশোক নেব। এভাবে খুব নূন্যতম একটা ভাতা তিনি বায়তুল মাল থেকে নিতে রাজি হলেন এবং এটা দিয়েই খেলাফতে থাকা সময়ে তিনি তাঁর সংসার এবং জীবন অতিবাহিত করেছেন। হযরত আবু উবায়দা (রা) প্রতিদিন তার ঘরে অর্ধ বকরীর গা০েশত পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আবূ বকর ইবন হাফস (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) ইনতিকালের সময় হযরত আয়িশা (রা)-কে বলেন, মুসলমানদের কাজ করার পারিশ্রমিক হিসাবে আমি পাই পয়সার ফায়দাও গ্রহণ করিনি। সাদামাঠা গোেেছর খাওয়া-পরা ব্যতীত। এ মুহূর্তে এই হাবশী গালোম, উটনী ও পুরাতন চাদরটি ছাড়া মুসলমানদের আর কোন মালামাল আমার কাছে নেই। আমার মৃত্যুর পর এগুলাোেক হযরত উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিও।
হযরত ইমাম হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইনতিকালের সময় আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেন, আমার মৃত্যুর পর এই উটনীটি যার দুধ আমি পান করছি, এই পিয়ালাটি যাতে করে আমি পান করতাম এবং এই চাদরটি উমরের নিকট পাঠিয়ে দেবে। কেননা এগুলাতেকে আমি খলীফা হিসাবে বায়তুল মাল থেকে নিয়েছিলাম। হযরত উমর (রা)-এর নিকট এগুলাতে পৌঁছার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবু বকরের উপর রহম করুন, আমার জন্য তিনি বহু কষ্ট করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বায়তুল মালে কখনাতে কোন সম্পদ জমা হতে দেননি। যা-কিছু আসতাকে মুসলমানদের জন্য তা ব্যয় করে ফেলতেন। ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিতেন। কখনা েঘাড়ো ও হাতিয়ার খরিদ করে আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিতেন। কখনা েকিছু পাশোক যা েগাড় করে গরীব-মিসকীনদের দান করতেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত উমর (রা) যখন অন্যান্য সাহাবাসহ বায়তুল মালের হিসাব-নিকাশ দিলেন, তখন তা সম্পূর্ণ শূন্য পেলেন।

পেশা:

মহল্লার মেয়েরা তাদের বকরী নিয়ে আবু বকর (রা)- এর নিকট আসতো এবং তাঁর দ্বারা দুধ দোহন করে নিয়ে যেতো। সিদ্দীকে আকবর (রা) অনেক মানুষের মধ্যে এমনভাবে মিলেমিশে বসতেন, কেউ চিনতেই পারতো না এদের মধ্যে খলীফা কো

হিকমাহ:

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের পর উমর (রা) যখন ভারসাম্য হারিয়ে চিৎকার করে বলছেন, যে বলবে আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকাল হয়েছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। তখন আবু বকর (রা) খুব বিচক্ষণতার সাথে এবং বলিষ্ঠভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন এবং মানুষদের তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। এছাড়াও তাঁর খিলাফতকালে তিনি যেভাবে মুরতাদ ও ভণ্ড নবী দাবীদারদের প্রতিহত করেছেন তা তাঁর হিকমাহ ও সাহসের বহিঃপ্রকাশ।

**হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণ:**

বায়'আতে সাকীফা থেকে ফিরে এসে তার পরদিন হযরত নবী করীম (সা)-এর কাফন-দাফন শেষ করে মসজিদে নববীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মিম্বরের উপর উপবেশন করে সাধারণ লোকদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তারপর দন্ডায়মান হয়ে ভাষণ দেন এবং হামদ ও না'ত-এর পর জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

"আমি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। সুতরাং আমি যদি সৎকাজ করি, তবে তামোদের কর্তব্য হচ্ছে আমাকে সাহায্য করা। আর যদি আমি কোন ভুল পথ অবলম্বন করি, তবে তামোদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে সোজাপথে প্রতিষ্ঠিত করা। সত্যবাদিতা ও সত্যকথা বলা একটি আমানত এবং মিথ্যা কথা হচ্ছে, একটি খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার নিকট শক্তিশালী- যে পর্যন্ত আমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিই। আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, সে আমার নিকট দুর্বল-যে পর্যন্ত আমি তার নিকট থেকে প্রাপ্য বুঝে না নিই। তোমরা

জিহাদ পরিত্যাগ করবে না। যে জাতি জিহাদ পরিত্যাগ করে, সে জাতি অপমানিত হয়। আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো, ততদিন তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করি, তবে তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করবে। কেননা, তখন তোমাদের উপর আমার আনুগত্য করা ফরয নয়।"

ঐ দিন ৩৩ হাজার সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবু বকর (রা)- এর সর্বপ্রথম উদ্যোগ- উসামা বিন বিন যায়েদ (রা) এর যে বাহিনীকে রাসূল (সা) পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের জন্য সে বাহিনী চূড়ান্ত অভিযানে যেতে পারেনি। খলিফা হয়ে আবু বকর (রা) প্রথম উদ্যোগ নিলেন সেই বাহিনীকে পাঠানোর জন্য।

**উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রাঃ**

হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে সিরিয়া অভিমুখে রোমানদের মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীসহ প্রেরণ করেছিলেন এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর রোগ বৃদ্ধির কারণে এই বাহিনী যাত্রা বিরতি করেছিল। এক্ষণে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই বাহিনী প্রেরণ করতে চাইলেন। সে সময় ২টা ফেতনা আরবের বিভিন্ন দেশ থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিলো। একটি, ধর্ম ত্যাগের ফিতনা।রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের পর আরবে ধর্মত্যাগের একটা হিড়িক পড়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়।
আরেকটা, অনেক মিথ্যা নবীর দাবিদার বের হয়েছিলো যেটা ছিলো খুব ভয়ংকর একটা ফিতনা। কেননা তারা সৈন্য সংগ্রহ করছিলো যুদ্ধ করার জন্য। অবস্থার প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কিরাম সব দিকে ধর্ম ত্যাগের খবর শুনে এবং মদীনার উপর হামলা করার আশংকা দেখা দেয়ায় এই বাহিনী প্রেরণ স্থগিত রাখার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট অনুরোধ করেন।সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ঈমানী শক্তি, মনোবল, হিম্মত ও সাহসিকতা, উদ্যম ও দৃঢ়তা পরিমাপ করুন। তিনি সবাইকে সাফ জবাব

দিলেন, আমাকে যদি কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চয়তাও প্রদান করে যে, এই বাহিনী প্রেরণ করার পর আমাকে মদীনায় কোন হিংস্র জন্তু একাকী পেয়ে ছিড়ে ফেলবে তবু আমি একটি বাহিনী প্রেরণ কখনো মুলতবি করবো না। কারণ এ বাহিনী স্বয়ং নবী করীম (সা) প্রেরণ করেছিলেন। অতএব তিনি এই মর্মে নির্দেশ জারি করলেন যে, উসামা বাহিনীতে যেসব লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা যেন যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মদীনার বাইরে সেনা শিবিরে দ্রুত সমবেত হয়।

এই নির্দেশ পালনার্থে সাহাবায়ে কিরাম হযরত উসামার ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হন। হযরত উসামা (রা)-এর পিতা যায়দ ইবন হারিসা (রা) ছিলেন নবী (সা)-এর মুক্ত গোলাম। তাই কোন কোন লোকের মনে তার নেতৃত্ব সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ ছিল। হযরত উসামা (রা)-এর বয়স ছিল তখন সতের বছর। তাই কারো কারো ইচ্ছা বয়স্ক কোন কুরায়শী নেতা নির্ধারণ করা হোক। উপরোক্ত ২টা কারণে তারা আবু বকর (রা) কে অনুরোধ করলেন উসামা বিন যায়েদ (রা) কে সেনাপতিত্বের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী মদীনার বাইরে সমবেত হলো তখন হযরত উসামা (রা) হযরত উমর ফারুক (রা)-কে (তিনিও এই বাহিনীর একজন সৈন্য ছিলেন) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর নিকট এই পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেন যে, বড় বড় লোক সবই আমার সঙ্গে রয়েছেন, আপনি তাদেরকে আপনার কাছে ডেকে নিন এবং আপনার কাছে রেখে দিন। কেননা, আমি আশংকা করছি যে, মুশরিকরা হামলা করে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে। হযরত উমর (রা) সেনা ছাউনী থেকে সেনাপতির পয়গাম নিয়ে যখন রওয়ানা করছিলেন, তখন আনসাররাও একটি পয়গাম হযরত উমর (রা)-এর মাধ্যমে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। পয়গামটি ছিল এরূপ আপনি এই বাহিনীর অধিনায়ক এমন কোন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করুন, যিনি হবেন উসামা থেকে বয়সে বড় ও শরীফ বংশের। হযরত উমর (রা) এসে সর্বপ্রথম আনসারদের পয়গাম পেশ করলেন। তখন হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) বললেন, এই বাহিনী প্রেরণ করার দরুন যদি সমস্ত বস্তি খালি হয়ে যায় এবং আমি স্বয়ং একাকী থেকে যাই আর হিংস্র জন্তুরা আমাকে তুলে নিয়ে যায়, তবুও এই বাহিনী প্রেরণ মুলতবি হতে পারে না। তারপর আনসারদের পয়গাম শুনে বললেন, তাদের অন্তরে এখন পর্যন্ত গর্ব ও অহংকারের চিহ্নঅবশিষ্ট রয়ে গেছে। একথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ঐ বাহিনীকে বিদায় করার জন্য পায়ে হেঁটে মদীনার বাইরে সেনা নিবাস পর্যন্ত চলে

গেলেন। হযরত উসামাকে বাহিনীসহ বিদায় করলেন এবং নিজে হযরত উসামা (রা)-এর ঘোড়ার পাশে থেকে আলাপ করতে করতে চললেন। হযরত উসামা (রা) বলরেন, হয়তো আপনি আরোহণ করুন অথবা আমি সওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলবো। সিদ্দীকে আকবর (রা) বললেন, আমি আরোহণ করবো না এবং তোমারও সওয়ারী থেকে নিচে নামার প্রয়োজন নেই। আর আমি যদি কিছু দূর আল্লাহর রাস্তায় বিদায় সম্বর্ধনাকারী হিসাবে তোমাদের ঘোড়ার সাথে পায়ে হেঁটে চলি, তাতে আমার কি ক্ষতি হবে? সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর এই কার্য পদ্ধতিই ছিল আনসারদের উপরাক্তো পয়গামের মোক্ষম জবাব। উসামা (রা)-এর ঘোড়ার পাশাপাশি তাকে এইভাবে পায়ে হেটে চলতে দেখে গোটা বাহিনীই হতবাক হয়ে পড়লো এবং সবার অন্তরের সেই কুণ্ঠাবোধ দূর হয়ে তদস্থলে আনুগত্য ও একনিষ্ঠতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গেলো।

## সোনালী উপদেশ

হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে উসামা (রাঃ) যখন পৃথক হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে অতি মূল্যবান উপদেশ দান করেন। তার কতিপয় নিম্নরূপ:

“খেয়ানত করবে না, ধোকা দেবে না, সম্পদ লুকোবে না, কারো অঙ্গ কাটবে না, বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোকদের হত্যা করবে না, খেজুর গাছ জ্বালাবে না, ফলবান গাছ কাটবে না, আহারের প্রয়োজন ব্যতীত ছাগল, গরু বা উট কাটবে না। তোমরা একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, যারা দুনিয়া পরিত্যাগ করে নিজ নিজ ইবাদতখানায় বসে আছে। তাদের উত্যক্ত করবে না।”

এ এমন মূল্যবান উপদেশাবলী, যা যুদ্ধনীতি রূপে গৃহীত হলে আজও দুনিয়া থেকে বর্বরতা ও হিংস্রতার অনেকটাই বিদায় হয়ে যেত।

উসামা বাহিনী ১লা রবিউস সানী ১১হিঃ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী 'কুযাআ' নামক জনপদসমূহ পদদলিত করে চল্লিশ দিন পরে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে ফিরে এলেন।

সিরিয়ার এ আক্রমণ ইসলামের জন্য অপরিমেয় উপকারী প্রমাণিত হলো। মুনাফিক ও মুরতাদরা বলতে লাগলো, মুসলমানদের শক্তিতে কোন হ্রাস ঘটেনি। নইলে তারা এত দূরে এত শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলায় নিজবাহিনী পাঠাতো না। ফলে অনেক মুরতাদ গোত্র ভীত হয়ে পুনরায় ইসলামে দাখিল হলো।

## উসামা (রা)-এর সাফল্য

হযরত উসামা (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে জর্ডান ও বলক উপত্যকায় হযরত ওসামা (রা) রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। রোমানকদের পরাজিত করে, এবং বিপুল পরিমাণ গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে চল্লিশ দিন পর মদিনায় ফিরে আসেন। এই বাহিনী যুদ্ধযাত্রা বাহ্যত অতি ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার ফলাফল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুব ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়।

এ যুদ্ধের ফলাফল যৌথ ছিল-

১। যারা ধর্মত্যাগী এবং মুরতাদ তারা মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যে, যারা রোমানদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসতে পারে তাদেরকে এত সহজে আক্রমণ করা যাবে না। দেশের এই শোরগোল ও নিরাপত্তাহীনতার সময়ও মুসলিম বাহিনী এরূপ রোমানকদের উপর হামলা করা যেন সকল মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের একথা জানিয়ে দিচ্ছিল যে, আমরা তোমাদের এই বিদ্রোহ ও প্রস্তুতিকে এতটুকু পরোয়া করি না। এই সাহস ও শক্তি কার্যকর ঘোষণা বিদ্রোহীদের আশাহত ও নিরুৎসাহিত করে চিন্তা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। এবং তারা আক্রমণের এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটে।

২। অনেকের মনে ধারণা ছড়িয়ে গিয়েছিল, যেভাবে মানুষ মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে এবং দ্বীন ত্যাগ করছে তাতে ইসলাম নিশ্চিত ও দুর্বল হয়ে যাবে। ওসামা (রা)- এর এই বিজয়ের ফলে এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তারা এই বাহিনীকে পাঠানোর যে বিরোধিতা করেছিলেন তা আসলে বিজ্ঞ কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না।

**ধর্মান্তর ফিতনা**

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওফাতের সাথে সাথে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মান্তরের ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতে লাগলো। এ ফিতনার কারণসমূহ নিম্নরূপ:

(১) ইসলামের পূর্বে আরববাসী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। ইসলাম এ সকল ভাগ একত্রিত করে এক জাতি করে দেয়। কিন্তু যেহেতু তারা দীর্ঘকাল যাবত এর অভ্যস্ত ছিল না, সেজন্য তারা এই জাতিগত ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য একটি শৃংখল মনে করলো এবং তা ভেঙ্গে পালাবার চিন্তা করতে লাগলো।

(২) কুরআনুল কারীমে ইসলামী হুকুমতের অর্থনৈতিক বিভাগের জন্য 'যাকাত'কে মৌলিক ভিত্তি ধার্য করা হয়েছে। যাকাত ইসলামের আইন অনুসারে ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রেদের মধ্যে বন্টন করা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। কিন্তু এ-ও একটি বোঝা হিসেবে মনে করা হলো এবং এ বোঝা ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য চেষ্টা হতে লাগলো।

(৩) শরাব আরবদের ঘটিতেই ছিল। এ ছিল তাদের খুব পছন্দনীয় খেলা। যিনা ছিল তাদের প্রিয় বিনোদন। ইসলামের আইন এসব অসৎ কর্মের উপর কড়া বাধা আরোপ করলো যা তাদের নিকট খুবই কষ্টকর মনে হয়েছিল।

এ সকল ব্যাধি তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল, যারা ইসলামের কেন্দ্র মদীনা থেকে দুরে নজদ, য়ামান ইত্যাদি এলাকায় বসবাস করত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহচর্য তাদের নসীব হয়নি। তারা ইসলামের প্রতিপত্তি দেখে মাথা নত করেছিল ঠিকই, কিন্তু অন্তরে বিনয় সৃষ্টি হয়নি। কুরআনে তাদেরই কথা এভাবে বর্ণনা করা

হয়েছেঃ

ط قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ
وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান আনলাম’। বল, ‘তোমরা ঈমান আননি’। বরং তোমরা বল, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করলাম’। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের কোন কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হুজরাত:১৪

সর্বোপরি আল্লাহর সত্য নবীর সাফল্য দেখে আরবে অনেক মিথ্যা নবুওওয়াতের দাবীদার আত্মপ্রকাশ করল। এই হতভাগারা মনে করল নবুওওযাতের দাবী পার্থিব উন্নতির একটি উত্তম উপায় হতে পারে। যেসব লোকের অন্তরে পূর্ব থেকেই ব্যাধি ছিল, তারা এইসব শয়তানের জালে সহজে আটকে পড়ে তাদের দলে শামিল হয়ে গেল।

## সিদ্দীকী দৃঢ়তা

এই ফিতনার আগুন নেভানোর জন্য সিদ্দীকী দৃঢ়তাই প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলে কতিপয় সাহাবী আরজ করলেন, এখন খুব নাজুক সময়। যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে নমনীয় আচরণ করা হোক। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, একটি ছাগলের বাচ্চাও যদি তারা আদায় করতে অস্বীকার করে যা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দেয়া হত, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। হযরত উসামা (রাঃ) ফিরে এলেই তিনি তাঁকে মদীনায় নিজ স্থলবর্তী নিযুক্ত করে আবাস ও যাবয়ান গোত্রসমূহের মোকাবেলায় বেরিয়ে পড়লেন। এ গোত্রগুলো পরাজিত হলো এবং তাদের চারণভূমি মুসলমান মুজাহিদদের ঘোড়ার জন্য ওয়াকফ করে দেয়া হলো।

ইতিমধ্যে উসামা বাহিনীর ক্লান্তি দূর হয়েছে। তিনি সে বাহিনী নিয়ে যুলকিসসা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। এ স্থানটি মদীনা থেকে নজদের দিকে এক বারীদ বা ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে তিনি গোটা ইসলামী বাহিনীকে এগার ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন নেতা নিযুক্ত করলেন এবং তাকে একটি পতাকা দিলেন।

এ এগারজন নেতাকে নিজ নিজ বাহিনী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রওয়ানা করা হলো। এগার জন নেতার নাম এই -

(১) খালেদ ইবনে আলীদ (২) ইকরামা ইবনে আবী জাহল (৩) শুরাহবীল ইবনে হাসানা (৪) মুহাজির ইবনে আবী উমায়্যা (৫) হুযায়ফা ইবনে মিহসান (৬) আরফাজা ইবনে হারছমা (৭) সুওয়দ ইবনে মুকাররিন (৮) আলা ইবনু্েল হাযরামী (৯) তুরায়ফা ইবনে হাজিয (১০) আমর ইবনে আস (১১) খালেদ ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

মুজাহিদদের এ বাহিনীসমূহের রওয়ানার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুরতাদদের নামে এক সাধারণ বার্তা প্রেরণ করেন। এ বার্তায় তিনি তাদেরকে ফেতনা ফাসাদ থেকে বিরত হতে ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে ফিরে আসতে আহ্বান জানান এবং তাদের সাথে ওয়াদা করেন যে, তারা যদি এ আহ্বান কবুল করে নেয় তাহলে তাদের কোনরূপ উত্যক্ত করা হবে না। অতঃপর মুজাহিদ বাহিনীর সেনানায়কদের নামে নিম্নোক্ত নির্দেশনামা জারী করেন:

"আমি ইসলামের মুজাহিদদের উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর আদেশ পালনে পুরো চেষ্টা চালায়, যেসকল লোক ইসলামের পরিসর থেকে বের হয়ে শয়তানের জালে আটকা পড়েছে,তাদের সাথে জিহাদ করে, কিন্তু তলোয়ার উঠানোর পূর্বে তাদেরকে ইসলামের বাণী পৌঁছাবে এবং তাদের উপর যুক্তিপূর্ণ করে, যদি তারা ইসলাম কবুল করে নেয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ হাত সংযত করবে। কিন্তু যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে তারা যতক্ষণ না ফিরে আসে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। মুরতাদরা যখন পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রধান তাদেরকে অবহিত করে দেবেন তাদের জিম্মায় ইসলামের কি কি অত্যাবশ্যক করণীয় রয়েছে এবং মুসলমানদের উপর তাদের কি কি প্রাপ্য রয়েছে। তাদের করণীয়সমূহ তাদের দ্বারা করানো হবে এবং তাদের প্রাপ্য আদায় করা হবে। বাহিনীপ্রধান নিজ সাথীদেরকে দ্রুততা ও ফেতনা ফাসাদ থেকে বিরত রাখবেন। দুশমনদের বসতি এলাকায় আকস্মিকভাবে প্রবেশ করবেন না। খুব দেখে শুনে প্রবেশ করবে পাছে মুসলমানদের কোন ক্ষতি না হয়। সেনা প্রধান রওয়ানা ও অবস্থানের সময় নিজ অধীনস্থদের সাথে মধ্যপন্থা ও নমনীয় আচরণ করবেন। তাদের দেখাশুনা করবেন, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং নরম ভাষায় কথা বলবেন।"

অতঃপর ইসলামী বাহিনীর দলসমূহ অভিজ্ঞ প্রধানদের নির্দেশনা মোতাবেক শত্রুর মোকাবেলায় রওয়ানা হয়।

**তুলায়হার তওবা**

বনূ আসাদে এক ব্যক্তি ছিল তুলায়হা। বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে এসে তার মাথায় নবুওওয়াতের পাগলামী চেপে বসল। সে নিজ কওমের মধ্যে নবুওওয়াতের দাবী করে বসল। বনু আসাদ সবাই তার অনুগত হয়ে গেল। বনু আসাদ ও বনু তাইয়ের মাঝে বন্ধুত্ব চুক্তি ছিল। অতএব, তারাও নিজ বন্ধুদের সাথী হল এবং গাতফান গোত্রের অনেক লোক তাতে শরীক হলো। তুলায়হা এই বিরাট বাহিনী নিয়ে নজদের বাজাখা প্রস্রবণের নিকটে এসে ছাউনি ফেলল।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ তুলায়হার মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হলেন। হযরত আদী ইবনে হাতেম তায়ী যিনি বনু তাইয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, এ সময় মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি নিজ গোত্রকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ ফেতনা থেকে মুক্ত করি। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন এবং হযরত আদী (রাঃ) এর প্রচেষ্ঠায় তাঁর গোত্রের সকল লোক তুলায়হা থেকে পৃথক হয়ে গেল। একই প্রচেষ্টা তিনি জাদীলা গোত্রেও চালালেন এবং সেখানেও তিনি সফল হলেন।

হযরত খালেদ (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে বাজাখা প্রস্রবনের তীরে পৌঁছালেন। তুলায়হা বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড মোকাবেলা হল। তুলায়হা বাহিনীর পরাজয়ের আলামত দেখা দিলে তুলায়হার সহযোগী গাতফান গোত্রের নেতা উয়ায়না ইবনে হুসায়ন ফাযারী তার নিকট এল। তুলায়হা এ সময় চাদরমুড়ি দিয়ে এমন ভাবে বসে ছিল যেন তার নিকট অহী নাযিল হচ্ছে। উয়ায়না জিজ্ঞেস করল, বলুন, জিবরীল কোন বার্তা নিয়ে এলেন। তুলায়হা বলল, হ্যাঁ। এরপর সে একটি ছন্দবদ্ধ কথা শুনালো, যার অর্থ- অবশেষে জয় আমাদের হবে। উয়ায়না বলল, হে ফাযারা, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। তারপর নিজের লোকদের নিয়ে তার বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেল।

তুলায়হা যখন দেখল যে, পরাজয় অবধারিত, তখন সে নিজের স্ত্রীসহ সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেল এবং পরবর্তীতে কুফর থেকে তওবা করে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করে। তুলায়হা পরবর্তীতে ইরাক বিজয়ের কালে খুব বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং নিজ গুনাহের কাফফারা আদায়ের চেষ্টা করে।

**মালেক ইবনে নুওয়রার হত্যা**

রসূলুল্লাহ (সঃ) বনূ তামীমে পাঁচ জন আমীর মনোনীত করেছিলেন। মহানবী (সঃ) এর ইন্তেকাল হলে তাদের কেউ কেউ মুরতাদ হয়ে গেল, আর কেউ কেউ ইসলামে অবিচল থাকলো। মুরতাদদের মধ্যে মালেক ইবনে নুওয়রাও ছিল। সে যাকাত প্রদানে বাঁধা দিল এবং গোত্রের মুসলমানদের সাথে লড়াই শুরু করে দিল। বনূ তামীমে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, তখন বনূ তাগলিব গোত্রের সাজাহ নামীয় এক মহিলা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। এ মহিলা পূর্বে খৃষ্টান ছিল। মহানবীর (সঃ) ইন্তেকালের পর তারও নবুওওয়াতের পাগলামী পেয়ে বসল এবং আরবের বেশ কিছু লম্পট তার সাথী হলো। সে তার সাথীদের নিয়ে মদীনায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। পথে বনু তামীমের বসতি এলাকার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে মালেক ইবনে নুওয়রার নিকট মৈত্রী বার্তা পাঠাল। মালেক তার বার্তা কবুল করে নিল এবং তাকে পরামর্শ দিল যে, মদীনা হামলা করার পূর্বে বন্ তামীমের মুসলমানদের উপর হামলা করা হোক। সাজাহ সে মুসলমানদের উপর হামলা করলো। তাদের সাথে মোকাবেলার শক্তি মুসলমানদের ছিল না। তাই তারা পালিয়ে গেল। সাজাহ তার বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। নাবাজ নামক স্থানে পৌঁছলে বনু তামীমেরই একটি দলের সাথে তার মোকাবেলা হলো। তারা তার কিছু ব্যক্তিকে বন্দী করে নিল। অবশেষে এই শর্তে সন্ধি হল যে, সাজাহ তাদের ব্যক্তিদের ছেড়ে দেবে এবং তারা তার লোকদের এবং সে মদীনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে ফিরে যাবে। সাজাহ ব্যর্থ হয়ে ইয়ামামার দিকে ফিরে গেল।

এ সময়ে বনু তামীমের মুরতাদদের আল্লাহ হেদায়াত দান করলেন। তারা পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করলো। কিন্তু মালেক ইবনে নুওয়রা এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। সে তার সাথীদের নিয়ে বাতাহ নামক স্থানে গিয়ে ছাউনী ফেলল। খালেদ

ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) তুলায়হার মোকাবেলা থেকে অবসর হয়ে মালেক ইবনে নুওয়রার মোকাবেলার উদ্দেশ্যে এগুলেন। মালেক তার সাথীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) লোক পাঠিয়ে মালেক ও তার সাথীদের গ্রেফতার করলেন। তিনি মালেকের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন এবং তার স্ত্রীকে বিবাহ করলেন।

মুসলমানদের কেউ কেউ হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, মালেক ইবনে নুওয়রা গ্রেফতার হবার পূর্বে নিজ এলাকায় আজান দেয়ায়ে ছিল। অতএব খালেদ তাকে হত্যা করিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। খালেদ ইবনে অলীদ জবাব দিলেন যে, মালেক মৃত্যুর ভয়ে আজান দেয়ায়েছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ফয়সালা করলেন যে, যেহেতু অবস্থা বিশ্লেষণে খালেদের ভুল হয়েছে, তাই তাঁর নিকট থেকে কিসাস (প্রতিহত্যা) গ্রহণ করা যাবে না এবং মালেক ইবনে নুওয়রার রক্তপণ নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিলেন। তিনি এ-ও বললেন, আল্লাহর তলোয়ার, যাকে তিনি কাফেরদের উপর চমকিত করেছেন, আমি তাকে লুকাবার কে?

**সাজাহ বিনতুল হারসঃ**

সাজাহ বিনতুল হারছ নবুওয়াতের দাবী করলো এবং বনু তাগলেবের সরদার হুযায়ল ইবন ইমরান, বনু তামারের সরদার উল্কা ইবন হিলাল ও বনূ শায়বানের সরদার সুলায়ল ইবন কায়স তার নবুওয়াতের দাবী মেনে নিলো। সে এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে সে তাঁর চারপাশে প্রায় চার হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী খুব অল্প সময়ে প্রস্তুত করে নিয়েছিলো। সে এই বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

সাজাহ তার বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হলো। যেহেতু সে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার ছিলো, সুতরাং সে তাঁর অনুসারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায অপরিহার্য রাখলো ও শূকরের গোশত খাওয়া, শরাব পান করা ও জিনা করা জায়েজ সাব্যস্ত করেছিল। বহু খ্রিস্টানও তাদের ধর্ম ত্যাগ করে সাজাহ'র দলভুক্ত হয়েছিল।

বনু তামীমের বস্তিগুলো পার হয়ে সাজাহ জানতে পারলো যে, খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) ইসলামী সৈন্যবাহিনী নিয়ে এদিকে আগমন করছেন। এদিকে মুসায়লামা

কাযযাবের বিরাট বাহিনীর কথা শুনে তাঁর সন্দেহ হলো, না জানি সেও নবুওয়াতের দাবীদার হওয়ার কারণে শত্রুতা ও বিরোধিতায় লেগে যায়। মুসায়লামা কাযযাব যখন সাজাহ বাহিনীর কথা শুনলো, তখন সেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলো। একদিকে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর আশংকা, আর অপর দিকে সাজাহ বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করেছে। তারা যদি এদিকে মনোনিবেশ করে, তবে বিরাট সংকট দেখা দেবে। এদিকে ইকরামা (রা) ও শুরাহবীলও তাঁদের বাহিনী নিয়ে ইয়ামামার নিকটবর্তী পৌছে গিয়েছিলেন এবং মুসায়লামা ও সাজাহকে পরস্পরের দোসর ভেবে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে মুসায়লামা সাজাহকে এই মর্মে পত্র লিখলো যে, তোমার অভিপ্রায় কি? সাজাহ উত্তর দিলো যে, আমি মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করতে চাই। আমি একজন নবী এবং শুনেছি আপনিও একজন নবী। তাই আমাদের উভয়কে সংঘবদ্ধভাবেই মদীনা আক্রমণ করা উচিত। মুসায়লামা সঙ্গে সঙ্গে পয়গাম পাঠালো যে, যতদিন হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবিত ছিলেন, ততদিন অর্ধেক রাজ্য তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং অর্ধেক রাজ্য আমি আমার নিজের এলাকা মনে করতাম। এখন তাঁর ওফাতের পর গোটা রাজ্যের উপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেহেতু তুমিও নবুওয়াত দাবী করছো তাই আমি অর্ধেক পয়গাম্বরী তোমাকে দিয়ে দেবো। উত্তম এই যে, তোমার সৈন্যবাহিনী ওখানে রেখে একাকী আমার নিকট চলে এসো, যাতে তোমার সাথে পয়গাম্বরী বন্টন ও মদীনা আক্রমণ সম্পর্কিত যাবতীয় আলাপ-আলোচনাও পরামর্শ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

## মিথ্যুক মহিলা নবীর বিবাহ

সাজাহ এই পয়গাম পেয়েই মুসায়লামার নিকট গমন করলো। সে তার দুর্গের সামনে একটি তাঁর স্থাপন করলো। সাজাহকে সেখানে অবতরণ করালো। উভয়ের কথোপকথন হলো। সাজাহ মুসায়লামার বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিলো এবং তার উপর ঈমান আনলো। তারপর উভয়ের বিবাহ হলো। বিবাহের পর সাজাহ তিন দিন পর্যন্ত মুসায়লামার নিকট থাকলো। সেখান থেকে বিদায় হয়ে তার গোত্রের মধ্যে এলো। এসে জানায় সে মুসায়লামা কে বিবাহ করেছে এবং তাঁর উপন ঈমান এনেছে। গোত্রের লোকেরা বললো, বিবাহের মোহর কোথায়? বিনা মোহরে তুমি কিরূপে বিবাহ করলে? তারপর সে মুসায়লামার নিকট গেলো। মুসায়লামা বললো, আমি তোমার মোহরে-বিনিময়ে তোমার

দলের জন্য দুই ওয়াক্ত নামায অর্থাৎ ঈশা ও ফজর মাফ করে দিলাম। সাজাহ সেখান থেকে বিদায় হয়ে এলো এবং জানালো এটাই ছিলো তার মোহরানা।

**মুসায়লামা কাজ্জাবের হত্যা**

বনূ হানীফা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। এই প্রতিনিধি দলে জনৈক মুসায়লামা ইবনে তামামাও ছিল। মুসায়লামা বলল-আমি মুসলমান হব, তবে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পরে আমাকে তাঁর খলীফা করবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাতে এ সময় একটি খেজুরের ডাল ছিল। তিনি বললেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে খেজুরের এই ডালটি আমার নিকট কামনা কর, তাহলেও আমি দেব না। আমি দেখছি যে, তুমি সেই মিথ্যাবাদী, যার সম্পর্কে আমাকে পূর্বেই স্বপ্নে জানানো হয়েছে।

মুসায়লামা এভাবে নিরাশ হয়ে নিজ দেশ য়ামামায় ফিরে গেল এবং মহানবী (সঃ) এর অসুস্থতার খবর শুনে নবুওওয়াতের দাবী করে বসল। সে বলল, আমাকে নবুওওয়াতিতে মুহাম্মাদ (সঃ) এর শরীক করে দেয়া হয়েছে। তারপর সে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকটে একটি পত্র পাঠাল। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল:

আল্লাহর রসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদে (সঃ) নামে-

"আপনাকে সালাম। আমাকে নবুওয়াতিতে আপনার শরীক করে দেয়া হয়েছে। অতএব, দুনিয়ার অর্ধেক আপনার, আর অর্ধেক আমার। কিন্তু আপনার ন্যায় বিচারে আমার আশা নেই।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জবাব দিলেন। হেদায়াত অনুসারীকে সালাম। পৃথিবী মূলতঃ আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তাঁকে তার উত্তরাধিকারী করেন, পরিণামে সাফল্য মুত্তাকীদের হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ইকরিমা (রাঃ) ইবনে আবী জাহলকে তার মোকাবেলায় পাঠান এবং তাঁর পিছনে শুরাহবীল ইবনে হাসানাকে তার সাহায্যের জন্য পাটালেন। ইকরিমাকে তিনি বলে দিয়েছিলেন শুরাহবিলের অপেক্ষা করতে। কিন্তু ইকরিমা বিজয়ের মুকুট একাকী নিজ মাথায় ধারণের আগ্রহে শুরাহবীলের অপেক্ষা না করে মুসায়লামার উপর হামলা করে বসলেন এবং পরাজিত হলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ঘটনা অবহিত হয়ে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন য়ামানের দিকে গিয়ে মুহরাবাসীদের মোকাবেলা করেন। খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এ সময় বনূ তামীমের মোকাবেলা থেকে অবসর হয়েছেন।

তাঁকে তিনি মুসায়লামার মস্তক চূর্ণ করতে পাঠালেন এবং শুরাহবীলকে আদেশ দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর অপেক্ষা করেন।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের পৌঁছানোর খবর পেয়ে মুসায়লামা তার চল্লিশ সহস্র জওয়ানের বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবেলার জন্য বের হল। দু বাহিনীর ঘোরতর লড়াই হল। প্রথম দিকে মুসলমানদের পরাজয়ের আলামত দেখা দিতে লাগল এবং মুসায়লামার লোকেরা হযরত খালেদের তাঁবুর নিকটে পৌঁছে গেল। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) সামলে নিয়ে হামলা চালালেন এবং অনেক দূর পর্যন্ত মুসায়লামার লোকদের ধাওয়া করে নিয়ে গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) স্বয়ং মুসায়লামাকে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানালেন। সে এল কিন্তু মোকাবেলায় টিকে থাকতে না পেরে পালালো। তার সৈন্যদের মধ্যেও পলায়ন শুরু হলো এবং শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলো। মুসায়লামা তার কিছু লোক নিয়ে একটি বাগানে গিয়ে লুকালো এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দিল। এই বাগানটি সে 'হাদীকাতুর রহমান' নামে আখ্যায়িত করেছিল। একজন বীর আনসারী হযরত বারা ইবনে মালিক (রাঃ) বললেন, আমাকে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে দাও। তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। তিনি একাকী মুসায়লামার প্রহরীদের হত্যা করে বাগানের দরজা খুলে দিলেন। এখন মুসলমানরা বাগানে ঢুকে পড়লেন এবং মুসায়লামার সাথীদের মৃত্যুশরাব পান করাতে লাগলেন। স্বয়ং মুসায়লামাও আল্লাহর তরবারী থেকে রেহাই পেল না। মুসায়লামার হত্যাকারীদের মধ্যে হযরত হামজা (রাঃ)-

এর শহীদকারী ওয়াহশী (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি যেন এভাবে নিজের গুনাহের কাফফারা আদায় করলেন।

মুসায়লামা নিহত হবার পর তার কওম 'বনূ হানিফা' মুসলমানদের সাথে নমনীয় শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিসম্পন্ন হতেই হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর আদেশ পৌঁছল যে, বনূ হানিফার সকল সৈন্যকে হত্যা করা হোক। কিন্তু হযরত খালেদ (রাঃ) যেহেতু তাদের সাথে চুক্তি করে ফেলেছিলেন, তাই তাতে অবিচল থাকলেন। পরে বনূ হানিফা গোত্র মুসলমান হয়ে যায়।

## আসওয়াদ আনাসীর হত্যা

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময়ে য়ামান বিজিত হলে তিনি (সঃ) বাজান ফারসীকে য়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। বাজান ছিলেন পারস্যরাজ কিসরার পক্ষ থেকে নিযুক্ত য়ামানের গভর্ণর। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। তাঁর রাজধানী ছিল সানআ। বাজানের ইন্তেকাল হলে তিনি য়ামানের প্রশাসন একাধিক আমেলের মধ্যে বন্টন করে দেন। এসব আমেলদের মধ্যে একজন ছিল বাজানের পুত্র শহর। তাকে সানআর আমেল নিযুক্ত করা হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে য়ামানের জনৈক আসওয়াদ (মূল নাম আবহালা, আনাস গোত্রের সাথে সম্পর্কিত) নবুওয়াতের দাবী করলো। মাযহাজ গোত্রের লোকেরা তার অনুসারী হলো। তারা আসওয়াদের সাথে মিলিত হয়ে নাজরানের উপর হামলা করলো এবং সেখান থেকে নাজরানের আমেল আমর ইবনে হাজমকে বহিষ্কার করলো। এখন আসওয়াদ তার কওমের সাতশত লোক নিয়ে সানআয় হামলা চালালো এবং সেখানকার গভর্ণর শহর ইবনে বাজানকে হত্যা করে সানআ আয়ত্ত নিয়ে নিল। এ বিজয়ের ফলে সমগ্র য়ামানে তার উৎসব পালন করা হলো এবং য়ামানের অনেক দুর্বলঈমান লোক তার পতাকাতলে একত্রিত হলো।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ পরিস্থিতির কথা জানলেন, তখন আবনা (ইয়ামানের ইরানী বাহিনী যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল) এর নেতাদের এবং হযরত আবূ মূসা আশআরী

(রাঃ) ও মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লিখে পাঠালেন যে, আসওয়াদকে যে কোন প্রকারে হত্যা করা হোক।

আসওয়াদ শহর ইবনে বাজানকে শহীদ করে তার স্ত্রীকে বিবাহ করে নিয়েছিল। শহর-এর স্ত্রী আসওয়াদকে খুব ঘৃণা করত এবং তার থাবা থেকে মুক্তি কামনা করছিল। আবনা বাহিনীর নেতা ফীরোজ ও দাজদিয়া তার সাহায্যে রাতে আসওয়াদকে হত্যা করে ফেলল এবং ভোর হলে আসওয়াদের ঘরের ছাদে উঠে আযান দিয়ে দিল। আযানের শব্দ শুনেই শোরগোল শুরু হল এবং আসওয়াদের লোকজন শহর ছেড়ে পালাতে লাগলো। তারা সানআ ও আদন-এর মধ্যবর্তী এলাকায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আসওয়াদের হত্যার মাধ্যমে য়ামানে স্থিরতা ও শৃংখলা বজায় হল। ইসলামী আমেলগণ নিজ নিজ কেন্দ্রে ফিরে গেলেন।

এই বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় পৌঁছে, তার পূর্বের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে এ ছিল প্রথম সুসংবাদ যা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায় এসেছিল। আসওয়াদের ফেতনা সর্বমোট চার মাস স্থায়ী ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের খবর য়ামানে পৌছুলে কায়স ইবনে আবদে ইয়াগূছ মুরতাদ হয়ে যায় এবং আসওয়াদের ছত্রভঙ্গ সাথীদেরকে তার পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান জানায়। এরা তার সাথে মিলিত হলো। কায়স তাদের সাহায্যে সানআ আয়ত্ত করে নিল এবং আবনার সন্তান সন্ততিকে ধরে নিয়ে তাদেরকে দ্বীপসমূহে বন্দী করে রাখল। আবনার নেতা ফীরোজ এ খবর জানতে পেরে বনূ উকায়ল ও রাআক এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এ গোত্রসমূহ তাকে সাহায্য করলো এবং আবনার সন্তানসন্ততিকে কায়সের লোকদের কবল থেকে মুক্ত করল। তারপর তারা ফীরোজের সাথে মিলিত হয়ে কায়সের মোকাবেলার জন্য রওয়ানা হলো। ইতিমধ্যে মুহাজির ইবনে আবী উমায়্যা যাঁকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) আসওয়াদের লোকদের মোকাবেলায় পাঠিয়েছিলেন এবং ইকরিমা (রাঃ) ইবনে আবী জাহল, যিনি আম্মান ও মুহরার অভিযান থেকে অবসর হয়েছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ বাহিনী সহ আবনার সাহায্যের জন্য এসে পৌছালেন।

ইসলামী বাহিনী সানআ আয়ত্ত করলো এবং কায়স ও আমর ইবনে মা'দীকারাব যুবায়রী (যে মুরতাদ হয়ে আসওয়াদের সাথী হয়েছিল) কে গ্রেফতার করে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। মদীনায় পৌঁছে তারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করল এবং পুনরায় মুসলমান হয়ে গেল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে মুক্তি দিলেন।

**গাযওয়ায়ে যাতুস-সালাসিলঃ**

পারস্যদের বিরুদ্ধে এটা সর্বপ্রথম অভিযান। পারস্য বিজয় হয় উমর (রা) এর সময় এবং প্রথম অভিযান চালানো হয় আবু বকর (রা)- এর সময়। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) এর নেতৃত্বে মোট আঠারো হাজার সৈন্য দিয়ে আবু বকর (রা) মুসলিম বাহিনীকে পাঠালেন। তাঁর সামনে ছিল ইরাকের সেই ইরানী প্রদেশ- যার নাম ছিল হুদায়র। ইরানের রাজ-দরবার থেকে ঐ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত ছিল হরমুয নামক জনৈক বাহাদুর ও যুদ্ধবাজ সরদার। এই হরমুযেরই ভীতি গোটা আরব, ইরাক ও হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেননা, সে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে হিন্দুস্তানের উপকূলে ও আক্রমণ চালাতো। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) বিবাদ মিটানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে হরমুযকে একটি চিঠি লিখে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। হরমুয এই চিঠি পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ ইরানের রাজদরবারকে তা অবহিত করলো এবং স্বয়ং সৈন্য সমাবেশ করে হযরত খালিদ (রা)-এর মুকাবিলায় অগ্রসর হলো এবং তাকে হত্যা করে। হরমুযের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র হযরত খালিদ (রা) হস্তগত করলেন। হরমুয ছিল ইরানী রাজদরবারের এমন একজন সরদার, যার মাথায় সর্বদা মুকুট পরিহিত থাকতো। তার মুকুটের মূল্য ছিল এক লাখ দীনার যা হযরত খালিদ (রা)-এর হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে ইরানী বাহিনীর একটি অংশ তাদের পায়ে জিঞ্জির বেঁধে নিয়েছিল, যাতে আরবদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে না পারে। কিন্তু তারপরও তাদের জিঞ্জির ভেঙ্গে পালাতে হলো। এই জিঞ্জিরের কারণেই এই যুদ্ধ 'জঙ্গে যাতিস-সালাসিল' (জিঞ্জির যুদ্ধ) নামে পরিচিত।

## ইয়ারমুকের যুদ্ধ

আবু বকর (রা) জীবদ্দশায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধ রোমানদের সাথে হয়। এতে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল চল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ হাজার। এ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান অংশ নেয় এবং সে যুদ্ধের কবিতা পাঠ করে অন্তরে জোশ ও যুদ্ধের উম্মাদনা সৃষ্টি করছিলেন। হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা) উচ্চকণ্ঠে সূরা আনফাল তিলাওয়াত করে মুসলিম যোদ্ধাদের মনে শাহাদাতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তলোয়ার ও খঞ্জর এবং তীর ও বর্শার ব্যবহার অতি তীব্র ও ক্ষিপ্রতার সাথে চালু ছিল। যোহর ও আসরের নামায মুসলিম যোদ্ধারা নিছক ইশারা-ইঙ্গিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে আদায় করেছেন। দিন শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলো না। অবশেষে রোমকরা সারা দিনের কষ্ট-ক্লেশে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় টিকতে পারলো না এবং মুসলিমরা জয়লাভ করে। ১৩ হিজরীর জুমাদিউস সানী মাসে মুসলিম বাহিনী নিরাপদে যুদ্ধ শেষ করে মদীনায় ফিরে আসে।

## হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর অসুখ ও ইন্তেকাল

৭ই জুমাদাল উখরা হিজরী সন ১৩ হযরত আবূ বকর (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। পনের দিন পর্যন্ত অবিরাম জ্বর চললো। অবশেষে ২১শে জুমাদাল উখরা হিজরী সন ১৩ বিকালে তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (মতান্তরে ২৩শে জুমাদাল উখরা)। হযরত আযেশা (রাঃ) এর কক্ষে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর খেলাফত কাল দুই বছর তিন মাস দশ দিন।

ইন্তেকালের সময় তিনি অসিয়ত করে যান যে, আমার জমি বিক্রি করে যেন ঐ অর্থ পরিশোধ করে দেয়া হয় যা আমি খেলাফতের পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ হুকুম পালন করা হয়েছিল। কাফন সম্পর্কে বলেন যে, আমার শরীরে বর্তমানে যে কাপড় রয়েছে তা-ই ধুয়ে তাতে কাফন দেবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আব্বাজান, এতো পুরোনো। তিনি বললেন, আমার জন্য এই ছেঁড়া পুরানো কাপড়ই যথেষ্ট।

তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমর (রাঃ) আরো কতিপয় প্রবীণ সাহাবীসহ বায়তুল মালের হিসেব নিলেন। সেখানে মাত্র একটি দীনার পাওয়া গেল। বায়তুল মালের খাজাঞ্চীকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, প্রথম থেকে এ পর্যন্ত খেলাফতের ভাণ্ডারে কত অর্থ এসে থাকবে? তিনি বললেন, দুই লাখ দীনার।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিয়ম ছিল, যা কিছু আসবে তৎক্ষণাৎ বন্টন করে দিতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর তরিকা অনুযায়ী তিনি সম্পদ জমিয়ে রাখা পছন্দ করতেন না।

## হযরত উমর রাঃ এর যুগ

**জন্ম ও বংশ-পরিচয়ঃ**

হযরত উমর (রা) বংশগতভাবে ছিলেন কুরাইশ বংশের অভিজাত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জাহেলি যুগ থেকে কুসাই বিন কিলাবের ইন্তেকালের পর তাঁর দায়িত্বগুলো বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিলো। রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যোগাযোগের দায়িত্ব ছিল উমর (রা) এর গোত্র বনু আদী এর উপর। রাষ্ট্রদূত এর এই পদটি তখন থেকেই অনেক সম্মানের বিষয়। তাই দূতের এই সম্মানিত কাজের জন্যেও বনু আদী- এর অন্যতম একটা সম্মান ছিলো কুরাইশদের মধ্যে।

উমর (রা) এর পুরো নাম- উমর ইবন খাত্তাব (রা) ইবন নুফায়েল ইবন আবদুল উযযা ইবন রিবাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কা'ব ইবন লুওয়াই। কা'ব বিন লুওয়াই ছিলো রাসূল (সা) এর বংশধারা। অর্থাৎ এই স্থরে এসে উমর (রা)- এর বংশতালিকা রাসূল (সা) এর বংশতালিকার সাথে মিলিত হয়েছে। কা'বের দুই ছেলে। একজন আদী এবং অপরজন মুররাহ। আদী- এর বংশধারার দিক থেকে উমর (রা) এসেছেন যার কারণে তাঁর বংশের নাম হয়েছে বনু আদী। উমর (রা) এর কুনিয়াহ ছিল আবু হাফস। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে "ফারুক" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) এর হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। বাল্যকালে তিনি উট চরাতেন। যৌবনে পৌঁছার পর আরবের

ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি বংশ-পরিচয় বিদ্যা, সমর বিদ্যা, অশ্বারোহন ও মল্লযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন যা ছিলো তৎকালীন আরব যুবকদের জন্য খুব সাহসিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য।

**উমর (রা)- এর পরিচয় ও কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য**

জাহেলিয়াতের যুগে এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও তিনি তাঁর পেশা হিসেবে ব্যবসা বানিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। উমর (রা)- এর পরিচয়, গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলতে গেলে পুরোটাই বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প। হযরত উমর ফারুক (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবের উকাষ নামক স্থানে, এক বিরাট মেলা বসতাকে, সেখানে ভূমিতে প্রায়ই মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তখন তাকে আরবের অন্যতম বিখ্যাত মল্লযাদ্ধো হিসাবে গণ্য করা হতাতে। অশ্বারাতেহণে তিনি এতই পারদর্শী ছিলেন যে, এক লাফে ঘাড়োর উপর সওয়ার হয়ে এরূপ স্থির হয়ে বসতেন যে, তার দেহ মার্কেটেই এদিক ওদিক হত না। ফুতুহুল বুলদান-এর বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রকাশের সময় কুরায়শ বংশে শুধু সতের জন লাকে লেখাপড়া জানতেন। আর হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি একেবারে প্রথম দিকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর হামজা (রা)- এর ইসলাম গ্রহণের ৩-৪ দিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য তিনি সাবিকীন (ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী ব্যক্তিবৃন্দ) ও 'আশারায়ে মুবাশশারা' (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি)-এর অন্যতম। তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বশুর। তিনি আলিম ও যাহিদ (ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ) হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি পাঁচশ ঊনচল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেন যা তিনি হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), সা'দ (রা), ইবন মাসউদ (রা), আবূ যার (রা), আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা), আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা), আনাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), আমর ইবন আস (রা), আবু মূসা আশআরী (রা), বারা ইবন আফিব (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং আরা েঅনেক প্রসিদ্ধ কয়েকজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে দিন হযরত উমর ফারক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন মুশরিকরা বলেছিল, আজ মুসলমানরা আমাদের থেকে কড়ায় গন্ডায় প্রতিশাধে গ্রহণ করলাতে। ঐদিন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়:

يأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী বিশ্বাসীগণ জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (৮:৬৪)

হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত: যেদিন হযরত উমর ফারুক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে ইসলামের সম্মান ও প্রতিপত্তি উল্লেখযাগ্যেভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল যেন ইসলামের জয়ের প্রতীক। তাঁর হিজরত ছিল যেন একটি নুসরাত বা বিরাট সাহায্য। তাঁর ইমামত বা নেতৃত্ব ছিল একটি রহমত। কাবা শরীফে গিয়ে সালাত আদায় করব সে সাধ্য আমাদের ছিল না। কিন্তু যখন হযরত উমর ফারক (রা) ঈমান আনেন, তখন তিনি মুশরিকদের সাথে এমন বাক-যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন যে, আমাদের জন্য কা'বা শরীফে সালাত আদায়ের বাধা অপসারিত হয়। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, যখন থেকে হযরত উমর ফারুক (রা) ঈমান আনেন, তখন থেকে ইসলাম যেন একজন ভাগ্যবান মানুষের রূপ নেয়। প্রতিটি পদে সে উন্নতি লাভ করতে থাকে। আর যখন তিনি শাহাদত বরণ করেন, তখন ইসলামের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ নেমে আসে এবং প্রতি পদেই উন্নতি ব্যাহত হতে থাকে।

হযরত ইবন সা'দ (রা) বলেন, যখন হযরত উমর (রা) ঈমান আনেন, প্রকৃতপক্ষে তখনই ইসলাম প্রকাশ লাভ করে। তখন হতে আমরা কাবা শরীফের তাওয়াফ করতে, মুশরিকের কাছ থেকে প্রতিশাধে গ্রহণ করতে এবং তাদের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করি। ইবন আসাকির হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই গাপেনে হিজরত করেছে, কিন্তু যখন হযরত উমর (রা) হিজরত করতে মনস্থ করেন, তিনি এক হাতে মুক্ত তরবারি নেন এবং অপর হাতে তীর ও পিঠে ধনুক ঝুলিয়ে পবিত্র কা'বা ঘরে আসেন, সাতবার কাবা শরীফ তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করেন। তারপর কুরায়শ নেতাদের একটি সমাবেশে যান এবং একের পর এক তাদের সবাইকে সম্বাধেন করে বলেন, তামোদের সর্বনাশ হাকে, যে কেউ আপন মাকে নিঃসন্তান এবং স্ত্রীকে বিধবা দেখতে চায়, সে আমার মুকাবিলা করুক।' তখন কেউই তাকে বাধা দেওয়ার দুঃসাহস করেনি।হযরত উমর (রা) প্রত্যেকটি যুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথী ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধে যখন গুজব ছড়িয়ে যায় যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যা করা হয়েছে তখনও তিনি স্বীয়

স্থানে অটল থাকেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি স্বচ্ছ প্রাসাদ যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যায় এবং যা অসম্ভব সুন্দর। একটি স্ত্রীলাকে জান্নাতের একটি প্রাসাদের পাশে বসে ওক করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার? জিবরাইল (আ) আমাকে বললেন, এটা উমরের প্রাসাদ। তারপর তিনি হযরত উমর (রা)-কে সম্বাধেন করে ইরশাদ করেন, আমার ইচ্ছা ছিল আমি সেখানে প্রবেশ করি কিন্তু তাক্ত মার 'গায়রাত' (মর্যাদাবাধ)-এর কথা আমার মনে পড়ল এবং আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। হযরত উমর (রা) কান্নায় ভেংগে পড়েন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার সাথে আমার কিসের গায়রাত? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি দুধ পান করেছি এবং তার সজীবতা আমার নখ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তারপর আমি সেই দুধ উমরকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে, হুযূর! এর তাবীর (ব্যাখ্যা) কি? তিনি উত্তর দিলেন, দুধ অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে মানে রাসূলুল্লাহ এর মাঝে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দান করেছিলেন এবং তিনি এই দুধ উমর (রা)- কে দিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ উমর (রা) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এই জ্ঞান তাঁর অন্তরে লাভ করেছেন।

**উমর রা এর প্রকৃষ্টতার উদাহরণ**

ইসলামের ইতিহাসে হজরত ওমর (রা.) এমন এক সাহাবি, যিনি ন্যায়পরায়ণতা, সৎ সাহস ও দ্বীনি গভীরতায় অনন্য ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) একাধিকবার বলেছেন- لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ‘যদি আমার পর কোনো নবী আসত, তবে তা হতো ওমর বিন খাত্তাব।’ (তিরমিজি: ৩৬৮৬, মুসনাদে আহমদ: ১৭৪০৫)

উমর (রা.) প্রকৃত কোরআনপ্রেমী ছিলেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিন হক বুঝতে পারতেন এবং হকের কাছে মাথানত করতেও সদাপ্রস্তুত থাকতেন। কোরআনের আকর্ষণে, কোরআনের সতত্য অনুধাবন করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন এক গুণ দিয়েছিলেন, যার বর্ণনা হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় উঠে এসেছে। এক হাদিসে নবীজি বলেন, আল্লাহ তাআলা ওমরের জবানে সত্য ঢেলে দেন, সে তাই বলে। (সুনানে আবু দাউদ: ২৯৬২)

মূলত কোরআনের প্রতি ওমরের (রা.) সীমাহীন ভালোবাসা ও ভক্তির বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে এমন সব কথা ঢেলে দিতেন, যেটা স্বয়ং কোরআনের কথা; আল্লাহর মর্জি ও সন্তুষ্টির কথা। ফলে পরবর্তীতে সে বার্তা নিয়েই কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে। সেরকম পাঁচটি ঘটনা হলোঃ

১. বদরের বন্দীদের ব্যাপারে মতামত

বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে অনেক কাফের বন্দি হয়। রাসুল (সা.) সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। আবু বকর (রা.) বলেন, 'আমরা মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিই।' কিন্তু উমর (রা.) বলেন, 'তারা হলো কাফের নেতা। আমরা তাদের হত্যা করি, যেন ইসলাম শত্রুমুক্ত হয়।' রাসুল (স.) আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী ফয়সালা করলেন। পরে উমর (রা.)-এর মতামতকে সমর্থন করে কোরআনের আয়াত নাজিল হলো।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন–
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰي حَتّٰي يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ ۗ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।সুরা আনফাল: ৬৭
এই আয়াতে হজরত ওমরের (রা.) অবস্থানকে সমর্থন করে কঠিন শাস্তির পক্ষেই আল্লাহর আদেশ আসে।

২. হিজাব বা পর্দার বিধান

উমর (রা.) একাধিকবার রাসুল (স.)-কে বলেছিলেন, 'আপনার ঘরে নানা ধরণের লোক আসে, আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে হিজাবের আড়ালে রাখতেন, তা শ্রেয় হতো।' এর পরে আয়াত নাজিল হয়,

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নবীর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে যাও, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।'সূরা আহযাব: ৫৩

এ আয়াতে নারীদের হিজাব বা পর্দার বিধান প্রবর্তিত হয়, যা উমর (রা.)-এর প্রস্তাবনার প্রতিফলন।

৩. মদের হারাম হওয়ার প্রক্রিয়া

মদ তখন আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। হজরত উমর (রা.) বারবার দোয়া করতেন- 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের বিষয়ে একটি স্পষ্ট বিধান দিন।' এরপর ধাপে ধাপে তিনটি আয়াত নাজিল হয়।

প্রথমে বলা হয়,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এ দুটোর মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও, তবে তাদের পাপ তাদের উপকার অপেক্ষা অনেক বড়। (সুরা বাকারা: ২১৯)

এরপর বলা হয়,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত (মাতাল) থাকো, তখন নামাজের কাছেও যেও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো।(সূরা নিসা: ৪৩)

সর্বশেষ আয়াত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক তীর—এ সবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, তোমরা এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।(সুরা মায়েদা: ৯০)
এই চূড়ান্ত আয়াতের মাধ্যমে মদ সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়, এবং হজরত ওমরের দোয়ার বাস্তবায়ন ঘটে।

৪. মুনাফিকদের জানাজা

মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুবরণ করলে রাসুল (স.) তার জানাজা পড়াতে চাইলেন। ওমর (রা.) বাধা দেন এবং বলেন, ‘সে মুনাফিক, তার জানাজা পড়া উচিত নয়।’ এরপর রাসুল (স.) তার জানাজার নামাজ আদায় করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আয়াত নাজিল হয়-
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

‘আর তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাজা পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহ ও তার রাসুলকে অস্বীকার করেছিল এবং ফাসেক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। (সুরা তাওবা: ৮৪)
পরে রাসুল (স.) বলেন, ‘আমি আল্লাহর আদেশ পাইনি, তাই পড়েছি। এখন আমি আর মুনাফিকদের জানাজা পড়ব না।’

৫. মাকামে ইবরাহিমকে নামাজের স্থান বানানো

উমর (রা.) প্রস্তাব দেন যে, মক্কায় কাবাঘরের পাশে অবস্থিত 'মাকামে ইব্রাহিম'-এ নামাজ আদায় করা উচিত। এরপর আয়াত নাজিল হয়-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

আর স্মরণ করো, যখন আমি এই ঘরকে (কাবাকে) মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।' আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।' (সুরা বাকারা: ১২৫)
এই আয়াত হজরত উমরের মতামত অনুযায়ী নাজিল হয়।

## হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)- এর পদচ্যুতির কারণ

খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)- কে সরানোর সবচেয়ে বেশি পরিচিত যে কারণটা ছিল, কোন কোন ঐতিহাসিক এক্ষেত্রে তাদের একটি সূক্ষ্ম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর তা হলাতে, যেহেতু হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) প্রত্যেকটি যুদ্ধেই জয় লাভ করছিলেন, তাই জনসাধারণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হতে পারত যে, হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর সেনাপতিত্বই এসব বিজয়ের কারণ। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানগণের সাফল্য ও বিজয় কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং এর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং ইসলামের বরকত। এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করাটা একটা উদ্দেশ্য ছিলো তাকে সরানোর। কিন্তু এই কারণটা কিছুটা কম যুক্তিযুক্ত। এর চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত কারণ যেটা পাওয়া যায় সেটা হল, খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)- এর সামরিক যোগ্যতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন ছিলোনা। কিন্তু তিনি রাগের মাথায় বা তাৎক্ষণিক কিছু অসতর্ক ও হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। যেমন, রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় একটা জায়গায় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) কে দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছেন সেখানে তারা ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলেছিল কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ভেবেছিলেন যে তারা ভয় পেয়ে এটা বলেছিলেন আর তাই তিনি

তাদেরকে সেখানে হত্যা করেছিলেন। এ ধরনের বেশকিছু ঘটনা ঘটেছিলো। উমর (রা) জানতেন, সামনে যে যুদ্ধের পরিস্থিতি আসছে তা অত্যন্ত নাজুক এবং এই পরিস্থিতিতে যদি মূল দায়িত্ব খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)- এর কাছে থাকে তবে তাঁর অসাবধানতার কারণে না যেন আবার মুসলিম বাহিনী ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়ে তিনি এই আশংকা করছিলেন। এজন্য তিনি তাকে নায়েবে সেনাপতি করলেন এবং মূল সেনাপতি হিসেবে আরেকজন সাহাবীকে তিনি নিয়োগ দিলেন। এটাই ছিলো খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)- সরানোর মূল কারণ।

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)- এর বিনাবাক্যে খলিফার আদেশ মেনে নেওয়া এটাই ছিলো অনেক বড় একটা বিষয়। উমর (রা)- এর সময় অর্ধ পৃথিবীর মালিক মুসলিম জাহান এইরকম একটা গৌরবময় প্রতাপশালী সেনাবাহিনীর প্রধান থাকতে পারা অনেক বড় একটা মর্যাদার বিষয়। কিন্তু উমর (রা) যখন তাকে সরালেন তিনি সেটা এক বাক্যে মেনে নিলেন। এখান থেকেও নেতার প্রতি আনুগত্যের একটা সবক পাওয়া যায়।

## খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে উমর (রা)- এর প্রথম পদক্ষেপ

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর অন্তিমশয্যায় তখন তিনি একটা ওসীয়ত করে যায়। ওসীয়তটি ছিল-

“আরব দেশে মুসলমান ব্যতীত কোন ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান যেন না থাকতে পারে। কাফের-মুশরিকদের আরব ভূ-খন্ড থেকে বের করে দিবে।”

উমর (রা) ক্ষমতায় আসার পরেই প্রথম এটার বাস্তবায়ন শুরু করেন। যেহেতু মুসলমানগণ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সায়ো দু'বছরের খিলাফত কালে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ অন্তিম উপদেশ বাস্তবায়নের সুযাগে তারা তখন পর্যন্ত পান নি।

## দামেস্ক বিজয়

হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতের শুরুতে আমরা ইসলামী বাহিনীকে ইয়ারমূক প্রান্তরে বিজয় ও সাফল্যের পতাকা উত্তোলনরত অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। ইয়ারমূক যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে ইসলামী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) জানতে পারলেন যে, পরাজিত রোমবাহিনী ফাহাল নামক স্থানে গিয়ে থেমেছে। অন্যদিকে রোমের কায়সার একটি বিশাল বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য দামেশকে জড়ো করেছেন। তিনি হযরত উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন দিকে এগুবো? হযরত উমর (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, একটি সৈন্যদল ফাহালের দিকে পাঠিয়ে দিন। তারা পরাজিতদের ব্যাপৃত রাখবে। আর নিজে দামেশকের দিকে অগ্রসর হোন। কেননা এটি শামের দুর্গ ও রাজধানী হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) একটি সৈন্যদল ফাহালের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। এরা সেখানে পৌছে শহর অবরোধ করে রইল। একটি দল হিমস ও দামেশকের মাঝখানে মোতায়েন করলেন, আরেকটি দল দামেস্ক ও ফিলিস্তীনের মাঝখানে মোতায়েন করলেন। যাতে এসকল স্থান থেকে সাহায্য পৌছুতে না পারে। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) দামেশকের দিকে অগ্রসর হলেন। দামেশকে রোমবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল নিসরাত ইবনে নাসতুস। সে মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে শহর বন্ধ করে বসে রইল। ইসলামী বাহিনী দামেশকের চারিদিক থেকে ঘিরে নিল। এক দরজায় ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ), আরেক দরজায় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ), তৃতীয় দরজায় খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) এবং চতুর্থ দরজায় য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ)। মুসলমানরা সত্তর দিন যাবত শহর অবরোধ করে পড়ে রইলেন। এ সময়ে কখনো কখনো রোমানরা প্রাচীরের উপরে উঠে তীরবাজি করত, মুসলমানরাও তার জবাব দিত। কিন্তু রোমানদের এ সাহস হত না যে, ময়দানে এসে মোকাবেলা করে।

### খালেদ (রাঃ) এর পুরুষোচিত সাহসিকতা

হযরত খালেদ (রাঃ) রাতে খুব কম ঘুমাতেন এবং দুশমনদের সংবাদ পুরোপুরি রাখতে চেষ্টা করতেন। একরাতে তিনি শহরে অস্বাভাবিক শোরগোলের শব্দ শুনলেন। গুপ্তচরদের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, দামে জেনারেলের ঘরে ছেলে

জন্মগ্রহণ করেছে। সেই আনন্দে দুর্গের অভ্যন্তরে নৃত্যগীত উল্লাসের আসর জমেছে এবং রোমানরা শরাব পান করে মাতাল হচ্ছে।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এ সুযোগের তৎক্ষণাৎ সদ্ব্যবহার করলেন। কতিপয় জানবাজ সাথীকে নিয়ে তিনি পরিখা পার হয়ে প্রাচীরের নীচে পৌঁছে গেলেন। রশির সিড়ি তৈরী করলেন এবং তার মাথায় ফাঁসি লাগিয়ে গম্বুজে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর সে রশির সিড়ি বেয়ে প্রাচীরে উঠে নামলেন এবং পাহারাদারদের হত্যা করে শহরের দরজা খুলে দিলেন। সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি দিলেন। তাকবীর ধ্বনি শুনেই খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) এর দলের সৈন্যরা দরজা দিয়ে শহরে করলেন। রোমানরা এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হল। কিছুই তো করতে পারল না। তাই শহরের অপর দরজা খুলে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হল এবং সন্ধির আবেদন করল।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) খালেদের (রাঃ) কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ইসলামী যুদ্ধনীতি অনুসারে তিনি তৎক্ষণাত তাদের আবেদন কবুল করে নিলেন এবং তিনি নিজের সেনাদলসহ সন্ধিকারীর বেশে শহরে প্রবেশ করলেন। শহরের মধ্যভাগে উভয় নেতার পরস্পর সাক্ষাত হল। তিনি রোমানদের চালাকি বুঝতে পারলেন। এখন এ বিষয় আলোচিত হল যে, শহর তলোয়ারে অধিকৃত সাব্যস্ত করা হবে না সন্ধির মাধ্যমে বিজিত মনে করা হবে? হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) পুরো শহর সন্ধির মাধ্যমে বিজিত সাব্যস্ত করলেন। তিনি রোমানদের সাথে যেসকল শর্ত ঠিক করেছিলেন, পুরো শহরে সেগুলোই জারী করা হল। শর্ত ছিল এই যে, বিজিতরা স্বর্ণরূপা ও সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আদায় করবে, মাথাপিছু এক দীনার এবং প্রতি শত বর্গফুট জমি থেকে এক পাত্র (নির্দিষ্ট) গম আদায় করবে। অতঃপর তাদের জীবন, সম্পদ, সম্পত্তি ও উপাসনালয়সমূহ নিরাপদ থাকবে এবং তাদের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। দামেস্ক বিজয় সংঘটিত হয় রজব ১৪ হিজরীতে।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ পাঠালেন। য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান (রাঃ) কে দামেস্ক দেখাশুনার জন্য রেখে যাওয়া হল। তিনি সেখানে অবস্থান করে পার্শ্ববর্তী শহরসমূহ সায়দা, আরাকা, জুবাইল ও বৈরূত জয়

করেন। য়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ানের ছোটভাই মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) কায়সারিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং তা জয় করেন।

**বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ঃ**

উমর (রা)- এর সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। আমর ইবনুল আস (রা) প্রথম উমর (রা)-এর নির্দেশে বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থান ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অঞ্চলে পাহাড়ি এলাকায়। আল্লাহপ্রদত্ত সুরক্ষিত অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিকভাবেই বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায়। আমর ইবনুল আস (রা) তাঁর প্রখর সামরিক দৃষ্টিবলে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর পক্ষে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের জন্য শাম অঞ্চলের মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা রাযি.-এর কাছে চিঠি প্রেরণ করেন।

আবু উবায়দা রাযি, ততদিনে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি-কে সঙ্গে নিয়ে শামের পুরো উত্তরাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। চিঠি পেয়ে তিনি এবার খালিদ (রা) কে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হন। বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে আবু উবায়দা রাযি, সেখানকার অধিবাসীদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে জানমালের নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। প্রথমে তারা তার প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তাদের সাথে একটা যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেলো আবু উবায়দা (রা) আরও কঠিন অবরোধ আরোপ করেন এবং বাইরে থেকে রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। অবরুদ্ধ বায়তুল মুকাদ্দাস বাইরের জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটা সময় সেখানকার বাসিন্দাদের রসদপত্র শেষ হয়ে গেলে তারা নগরীর বাইরে বেরিয়ে এসে হামলা চালালেও খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ও ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী তাদেরকে পরাভূত করে।ধীরে ধীরে ইলিয়াবাসীর প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হতে থাকে। একসময় তারা উপলব্ধি করে যে, তাদের পক্ষে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকা সম্ভব নয় আর আবু উবায়দাও ইলিয়া জয় না করে ফিরবেন না। তখন তারা আবু উবায়দা রাযি.-এর কাছে বার্তা পাঠায় যে, আমরা আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাই। আপনি দয়া করে আপনাদের

খলিফা উমরকে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন সশরীরে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়ে আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেন এবং আমাদেরকে নিরাপত্তানামা প্রদান করেন।

আবু উবায়দা রাযি. বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবি মুআয ইবনে জাবাল রাযি.-এর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন না। মুআয রাযি.-কে কিছুদিন পূর্বেই তিনি জর্ডানে পাঠিয়েছিলেন। ইলিয়াবাসীর প্রস্তাব পাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ তিনি মুআয রাযি.-কে তলব করেন। মুআয রাযি. উপস্থিত হলে তিনি তার সঙ্গে ইলিয়াবাসীর প্রস্তাবের বিষয়ে পরামর্শ করেন। মুআয রাযি. তাকে বলেন, আপনার বার্তা পেয়ে হয়তো খলিফাতুল মুসলিমিন কষ্ট করে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে উপস্থিত হবেন। কিন্তু এরপর যদি ইলিয়াবাসী সন্ধিচুক্তি করতে অস্বীকার করে বসে, তাহলে খলিফার এত কষ্টের সফর ফলদায়ক হবে না। সুতরাং আপনি আগে ইলিয়াবাসীকে দৃঢ়তার সঙ্গে শপথ করে বলতে বলুন যে, খলিফা উপস্থিত হয়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করলে তারা অবশ্যই জিজিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করবে। মুআয রাযি.-এর পরামর্শমতো আবু উবায়দা রাযি, ইলিয়াবাসীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন; এরপর বার্তা পাঠিয়ে খলিফাকে বিস্তারিত অবহিত করার পাশাপাশি বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানান।

সেনাপতিগণ নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত স্থানে খলিফাতুল মুসলিমিনকে স্বাগত জানাতে সমবেত হয়। সেই মহান খলিফা, যার নাম ও খ্যাতি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছে আরব ভূখণ্ড ছাড়িয়ে রোমান সাম্রাজ্যে ও পারস্য ভূমিতে। এ সময় সেই বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটে, কিছুদূর উমর (রা) যাচ্ছিলেন, কিছুদূর তাঁর ভৃত্য যাচ্ছিলেন। মহান খলিফা উমর (রা)- এর জামায় এত জোড়াতালি দেওয়া ছিলো এবং এত ধুলোমলিন পোশাক তিনি পরেছিলেন যে যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করছেন তখন তিনি গাধার লাগাম ধরে আছেন আর তাঁর ভৃত্য গাধায় বসে আছে এবং উমর (রা)- এর চাইতে তাঁর ভৃত্যের পোশাক ছিলো আরও ভালো অবস্থায়। যার কারণে সবাই তাঁর ভৃত্যকেই প্রথমে উমর (রা) ভাবে। পরবর্তীতে তাদের সবার ভুল ভাঙ্গে। এরপর উমর (রা) তাদের সাথে একটি ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র সাক্ষর করে তাদের কাছ থেকে নগরীর চাবি বুঝে নিলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগমনের পর প্রথমবারের মতো বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের অধীনে আসে।

## খলিফা উমর রাযি. এর স্মরণীয় দুটি ঘটনা

উমর (রা) এমন একজন শাসক ছিলেন যে তাঁর খিলাফতকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দুটি ঘটনাই যথেষ্ট।

[এক]

হজরত উমর রাযি.-এর খাদেম আসলাম বলেন, একরাতে আমি উমর (রা) এর সঙ্গে বের হলাম এবং মদিনা থেকে দূরে চলে এলাম। আমরা দূরবর্তী বাড়িঘরের অধিবাসীদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমরা দূরে আগুন দেখতে পেলাম। উমর (রা) বললেন, 'আসলাম! মনে হয়, সেখানে কোনো কাফেলা আছে, রাত ও শীতের কারণে তারা সেখানে আটকে গেছে। চলো, আমরা সেখানে যাই। আমরা দ্রুতপদে সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম, একজন নারী কয়েকজন শিশুসহ অবস্থান করছে। আগুনের ওপর একটি ডেকচিও বসানো আছে। বাচ্চাদের মা রান্নার ভান করছিলো তাদেরকে স্বান্তনা দেওয়া জন্য। উমর (রা) এ দৃশ্য দেখে ব্যথিত হলেন, কষ্ট পেলেন এবং তিনি দ্রুতপদে বায়তুল মালে ফিরে আসলেন। বায়তুল মাল থেকে এক বস্তা আটা ও এক পাত্র চর্বি-তেল বের করে তিনি নিজের পিঠে তা বহন করে নিয়ে যেতে লাগলেন। তখন তাঁর খাদেম আসলাম বললো, " আমিরুল মু'মিনিন আমিই আপনার পক্ষ থেকে বহন করছি।

খলিফা অসন্তোষকণ্ঠে বললেন, 'আরে হতচ্ছাড়া। তুমি কি কিয়ামতের দিন আমার বোঝা বহন করবে?

এ ঘটনা থেকে একটা শিক্ষনীয় দিক, অধীনস্থদের ব্যাপারে বা প্রজা ও জনগণের হকের ব্যাপারে একজন খলিফার কীরকম সচেতনতা থাকা উচিৎ তা এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়। এছাড়া উমর (রা)- এর আরেকটা বিখ্যাত কথা, ফোরাক নদীর তীরে যদি একটা কুকুর ও না খেয়ে মারা যায় তাহলে এর জন্য কেয়ামতের দিন উমরকে জবাবদিহিতা করতে হবে।

[দুই]

আরেক রাতে খলিফা উমর (রা) বেরিয়েছেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, একটি ঘর থেকে এক নারীকণ্ঠের রোদনধ্বনি ভেসে আসছে আর ঘরের দরজায় এক ব্যক্তি বসে আছে। উমর রাযি. লোকটিকে সালাম দিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি জানাল, সে একজন বেদুইন; আমিরুল মুমিনিনের অনুগ্রহ প্রত্যাশায় মদিনায় এসেছে। উমর জিজ্ঞেস করলেন, ঘরের ভেতর থেকে কীসের আওয়াজ ভেসে আসছে?
লোকটি তখনও উমর রাযি.-কে চিনতে পারেনি। সে উত্তর দিলো, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি দয়া করে নিজের কাজে যান, যা জানা আপনার প্রয়োজন নেই, সে বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। উমর রাযি, বারবার পীড়াপীড়ি করায় সে উত্তর দিলো, একজন নারী আসন্ন প্রসববেদনায় কাঁদছে; কিন্তু তাঁর কাছে সহায়তা করার মতো কেউ নেই।' উমর রাযি, তৎক্ষণাৎ দ্রুত বাড়িতে ফিরে এলেন এবং তার স্ত্রী (আলি রাযি.-এর কন্যা) উম্মে কুলসুমকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার কাছে সাওয়াব অর্জনের এক সুযোগ এনে দিয়েছেন। তুমি কি তা অর্জনে আগ্রহী? স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? উমর রাযি, তাকে বিস্তারিত অবহিত করলেন এবং সদ্যপ্রসূত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় এবং প্রসূতি মায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে।

প্রসূতি নারীটি সন্তান প্রসব করার পর ভেতর থেকে উমর রাযি.-এর স্ত্রী বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন। আপনার সঙ্গীকে পুত্রসন্তানের পিতৃত্বের সুসংবাদ দিন। বেদুইন ব্যক্তিটি আমিরুল মুমিনিনের পরিচয় পেয়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল এবং ভয়ে ও শ্রদ্ধায় উঠে খলিফার কাছ থেকে দূরে সরতে লাগল। উমর রাযি. তাকে বললেন, যেভাবে ছিলে, নির্দ্বিধায় সেভাবেই বসে থাক।

**খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-এর শাহাদাত**

একদিন উমর (রা) মদিনার এক বাজারে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেসময় দেখেন জনৈক ক্রীতদাস যার নাম ছিলো আবু লু'লু। সে একধরনের চাক্কি বানাতে পারতো যা বাতাসে ঘুরতো। সে এ ধরনের চাক্কি তৈরিতে খুব বিখ্যাত ছিলো। উমর (রা) তখন তাকে

বললেন, আমি শুনেছি তুমি এমন চাক্কি বানাতে পার, যা বাতাসের উপর ভর করে চলে। তুমি আমার জন্যও এ ধরনের একটি চাক্কি বানিয়ে দাও না? সে উত্তর দিল, বেশ আমি আপনাকে এমন একটি চাক্কি বানিয়ে দেব, যার শব্দ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্র শোনা যাবে। উমর (রা) কে চাক্কি বানিয়ে দিলে উমর (রা) তাঁকে পারিশ্রমিক দিলেন। পারিশ্রমিক পেয়ে আবূ লু'লু খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং পারিশ্রমিক আরও বাড়ানোর কথা জানায়। উমর (রা) বলেন, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। তুমি এটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো। এতে আবু লু'লু উমর (রা)- কে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বেশ কয়েকদিন সে উমর (রা)- কে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং একদিন ফজরের সালাতের সময় বিষমিশ্রিত একটি খঞ্জর তাঁর কোমরবন্ধনীর মধ্যে লুকিয়ে উমর (রা) এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। উমর (রা) ইমাম হিসাবে আগে বেড়ে নামায পড়াতে শুরু করলেন, তখন মুক্তাদিগণের প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান আবু 'লুলু' খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খঞ্জর দ্বারা হযরত উমর (রা)-কে একে একে ছয়টি আঘাত করল। একটি আঘাত ঠিক নাভীর নীচে পড়ে। তাঁর পাকস্থলী ছিদ্র হয়ে গিয়েছিলো। যখনই তাকে পানি বা দুধ খেতে দেওয়া হচ্ছিল, তখনই তা পেট দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলো। উমর (রা) হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে টেনে নিয়ে ইমামতি করার জন্য নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেন এবং আঘাতের যন্ত্রণায় বেহুশ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। এভাবে যেতে যেতে যখন যোহরের আজান হয়ে গেলো, এ সময় তিনি তড়িঘড়ি করে সালাতের জন্য উঠার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তখনই আবারও ঢলে পরে গেলেন। তখন সাহাবীরা সবাই তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, আপনি এখন উঠতে পারবেন না। উমর (রা) খুব আফসোস করছিলো সালাতের সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে পারছেনা এজন্য।

এইখান থেকেও দেখা যায়, সালাতের ব্যাপারে সাহাবিদের কি পরিমাণ চিন্তা ছিলো যে, উমর (রা) এর পেট ছিদ্র হয়ে পাকস্থলী দিয়ে খাবার বের হয়ে যাচ্ছে অথচ তখনও তিনি চিন্তা করছেন তাঁর সালাত ছুটে যাচ্ছে। এভাবেই কিছুক্ষণ পর উমর (রা) ইন্তেকাল করেন।

# হযরত উসমান রাঃ এর খিলাফত

**জন্ম ও পরিচয়**

নাম উসমান, উপনাম আবু বকর, আবু আমর, উপাধি যুন নূরাইন। পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়া। তাঁর বংশপরম্পরা নিম্নরূপ:

উসমান পিতা আফফান পিতা আবুল আস পিতা উমাইয়া পিতা আবদে শামস পিতা আবদে মানাফ পিতা কসায়ি্য। এরূপে তাঁর বংশ পরম্পরা পঞ্চম পুরুষে আবদে মানাফে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে মিলিত হয়। তাছাড়া তাঁর নানী বায়যা উম্মে হাকীম পিতা আবদুল মুত্তালিব রাসুলে আকরাম (সঃ) এর ফুফু। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর দু কন্যা পরপর তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সে কারণে তিনি যুন নূরাইন উপাধীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত উসমান (রাঃ) এর পরিবার ইসলামপূর্ব যুগে অত্যন্ত সম্মানিত বলে গণ্য ছিল। কুরাইশদের জাতীয় পতাকা উকাব এ পরিবারেরই আয়ত্তে থাকত। তাঁর প্রপিতামহ উমাইয়া ইবনে আবদে শামস কুরাইশের বিশিষ্ট নেতা ও সর্দার ছিলেন। কুরাইশের কোন পরিবার যদি বনু হাশিমের সমকক্ষ দাবী করতে পারত তাহলে তা বনু উমাইয়াই ছিল।

হযরত উসমান গনী (রাঃ) হস্তী ঘটনার ষষ্ঠ বছরে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি কাপড়ের ব্যবসা অবলম্বন করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ পেশায় খুবই বরকত দান করেন। তিনি প্রচুর অর্থ উর্পাজন করেন এবং আল্লাহর রাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর মাহাত্ম্য ও বদান্যতা এবং সচ্চরিত্রের কারণে কুরাইশদের মধ্যে তাঁকে সম্মান ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা হত।

**খলিফা নির্বাচন**

হযরত উমর (রাঃ) এর অসিয়ত মোতাবেক মিকদাদ এ "পরামর্শ দল"কে মিসওয়ার ইবনে মাখরামার বাড়ীতে একত্রিত করলেন। হযরত তালহা (রাঃ) যেহেতু পূর্ব থেকেই

বাইরে গিয়ে ছিলেন, তাই তিনি শরীক ছিলেন না। হযরত উমর (রাঃ) ও তা-ই বলেছিলেন যে, তিনি তিন দিনের মধ্যে এলে পরামর্শে শরীক হবেন, নইলে আচ্ছা।

কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হতে থাকল। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, যিনি খেলাফত থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর এ অধিকার থাকবে যে তিনি কাউকে খলীফা নির্বাচন করবেন। বলুন কে এজন্য প্রস্তুত রয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাবে যখন সবাই নীরব রইলেন, তখন আবদুর রহমান (রাঃ) বললেন, আমি নিজে এজন্য প্রস্তুত রয়েছি। হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত সকলে বললেন, আমরা আমাদের নির্বাচনাধিকার আপনাকে ন্যস্ত করলাম। আপনি যাকে ইচ্ছা খলীফা ঘোষণা করুন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বলেন? হযরত আলী (রাঃ) উত্তর দিলেন, আপনি যদি অঙ্গীকার করেন যে, ন্যায় বিচার করবেন, কোন আত্মীয়ের পক্ষপাতিত্ব করবেন না এবং উম্মতের কল্যাণাকাংখা লক্ষ্য রাখবেন, তাহলে আমিও আপনার ফয়সালায় রাজী রয়েছি। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) উত্তর দিলেন আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, আমি কোন আত্মীয়কে আত্মীয়তার কারণে প্রাধান্য দেব না এবং মুসলমানদের কল্যাণের বিষয় সর্বদা লক্ষ্য রাখব।

এ সিদ্ধান্তের পর খলীফা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এর কাঁধে এসে পড়ল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) নিজের এ গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) এর ওফাতের কারণে সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবা সেনাধ্যক্ষগণ ও আঞ্চলিক শাসকবৃন্দ মদীনায় সমবেত ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) রাতের আঁধারে চাদর মুড়ি দিয়ে একেক জনের নিকট যেতেন এবং তার স্বাধীন মতামত নিতেন। শুধুমাত্র বনু হাশিম হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষাবলম্বী ছিলেন। অবশিষ্ট সকলের একই রায় ছিল এই যে, হযরত উসমান (রাঃ) কে খলীফা করা হোক।হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, "এ পদ যদি আপনার হাসিল না হয়, তাহলে আপনি এজন্য কাকে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত মনে করেন?" হযরত আলী (রাঃ) বললেন, উসমান (রাঃ)কে। হযরত উসমান (রাঃ) কেও একই প্রশ্ন করা হলো। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর নাম বললেন।

অবশেষে সেই তৃতীয় রাতটি এসে গেল যে রাত প্রভাত হয়ে গেলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)কে নিজ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে। এ রাতে তিনি এক এক করে চার শূরা সদস্যের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা করলেন। অবশেষে মুয়াজ্জিনের আজান তাঁকে আলাপ সমাপ্ত করিয়ে দিল।

ফজরের নামাজের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মসজিদে নববীতে আগমন করলেন। পুরো মসজিদ নতুন খলীফার নাম ঘোষণা শোনার জন্য ভিড়ে ভরা ছিল।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) প্রথমে দীর্ঘক্ষণ দুআ করলেন। অতঃপর বললেন, লোকসকল, আমি খেলাফতের বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি এবং মানুষের সাথে সাক্ষাত করে তাদের মতামত জেনে নিয়েছি। আমি আশা করি যে, আমার সিদ্ধান্তের সাথে কারো দ্বিমত থাকবে না। অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ) কে ডেকে বললেন, অঙ্গীকার করুণ যে, আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নত এবং দু মুরব্বীর (আবূ বকর ও উমর) আদর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন। হযরত উছমান (রাঃ) বললেন, আমি নিজ জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী এমনটিই করব। এ অঙ্গীকার নেবার পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এর হাতে বায়আত করলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বায়আত করতেই লোকেরা চারিদিক থেকে হযরত উসমান (রাঃ) এর প্রতি ভেঙ্গে পড়ল এবং বায়আত করতে লাগলো। হযরত আলী (রাঃ) ও তৎক্ষণাৎ বা কিছুক্ষণ পরে বায়আত করলেন। এ ঘটনা ২৯ শে জিলহজ্জ হিজরী ২৩ সনের।

হযরত তালহা (রাঃ) উসমান (রাঃ) এর বায়াতের পরে উপস্থিত হলেন। হযরত উসমান (রাঃ) তাকে বললেন- আপনার ইচ্ছা, চাইলে এ বায়আত বজায় রাখতে পারেন বা ভেঙ্গে দিতে পারেন। হযরত তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন সকলে কি উসমানের বায়আত করেছে? লোকেরা উত্তর দিল হ্যাঁ। হযরত তালহা (রাঃ) তখন বললেন, সকলের ফয়সালার সাথে আমারও ঐকমত্য রয়েছে।

## খলিফা হিসেবে উসমান রাযি.-এর প্রথম ভাষণ

উসমান রাযি. তার খিলাফতকাল শুরু করেন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণের মাধ্যমে। হামদ ও ছানার পর তিনি বলেন,

লোকসকল, নিঃসন্দেহে প্রতিটি আরোহণের সূচনা কঠিন হয়ে থাকে। আজকের পর আরও দিন আছে। আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে তোমাদের সামনে যথাযথভাবে আরও ভাষণ আসবে। আমি তো বাগ্মী নই (তিনি স্বভাববক্তা ছিলেন না); শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা আমাকে তা শিখিয়ে দেবেন। আর একজন বাগ্মী শাসকের তুলনায় একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক তোমাদের বেশি প্রয়োজন।

দায়িত্বগ্রহণের পর খলিফা উসমান রা. চারটি পত্র লেখেন। প্রথমটি গভর্নরদের উদ্দেশে, দ্বিতীয়টি খারাজ-সদকা উসুলকারীদের উদ্দেশে, তৃতীয়টি সাধারণ জনগণের উদ্দেশে এবং চতুর্থটি যুদ্ধরত বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতিদের উদ্দেশে। প্রতিটি পত্রে তিনি তার স্বরাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসননীতি সুনির্ধারিতভাবে উল্লেখ করেনএবং এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন যে, হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের অনুসৃত পথেই চলবেন।

উসমান রাযি, তার পূর্বসূরি উমর রাযি.-এর ন্যায় কঠোর ছিলেন না। আর এতে আপত্তিরও কিছু নেই। প্রত্যেকেরই আছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও নীতি।

খলিফা উসমান রাখি, এর সঞ্চরখানে পরিবেশিত হতো কচি মেষশাবকের গোশত ও চালনি দিয়ে ঢাকা সাদা ময়দার রুটি। তাকে যখন বল্য হয়। (আপনার পূর্বতন খলিফা) উমর তো শুধু বয়স্ক মেষের গোশতই খেতেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা উমরের প্রতি রহম করুন। উমরের মতো সংযম ও সহন-ক্ষমতা কার আছে?'

খলিফা হওয়ার পর উসমান রাযি, জনসাধারণের জীবনধারায় ব্যাপকতা আনতে সচেষ্ট হন। আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের প্রাচুর্যের বিবেচনায় এটিই ছিল স্বাভাবিক বিষয়।

**প্রথম মোকদ্দমা**

মূলত: হযরত উমর (রাঃ) এর শাহাদাত ছিল এক চক্রান্তের ফল। এ চক্রান্তে আবু লু'লু ব্যতীত জাফীনা ও হুরমুজানও জড়িত ছিল। আবু লু'লু ছিল নিহাওন্দের অধিবাসী পারসিক গোলাম আর জাফীনা হীরার অধিবাসী খৃষ্টান। হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে গৌরবময় বিজয় এবং পারস্য ও খৃষ্টান রাজ্যসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংসের কারণে তাদের অন্তরে হিংসা ও ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। নিহাওন্দ বিজয়ের পর সেখানকার কয়েদীরা এসে পৌঁছলে আবু লু'লু এক একটি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আর কেঁদে কেঁদে বলছিল-'উমর আমার কলিজা খেয়ে ফেলেছে।

যে ভোরে হযরত উমর (রাঃ) শহীদ হন সে রাতে আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) দেখলেন যে, আবু লু'লু, জাফীনা ও হুরমুজান পরস্পর কানাঘুষা করছে। তারা তাঁকে দেখে ঘাবড়ে গেল এবং পৃথক হয়ে গেল। তাদের ভীতির সময়ে তাদের মধ্যে কারো কাপড়ের মধ্যে থেকে খঞ্জর বের হয়ে পড়ে গেল। এর দুদিকে ধার আর মাঝখানে হাতল ছিল।

উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) এ ঘটনা শুনে যে খঞ্জরে হযরত উমর (রাঃ)

শহীদ হয়েছিলেন সেটি চেয়ে নিয়ে দেখলেন। খঞ্জরটি অবিকল তেমনই ছিল যেমনটি আবদুর রহমান বর্ণনা করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ রাগে নিজ উত্তেজনা আয়ত্তে রাখতে পারলেন না এবং জাফীনা ও হুরমুজানকে হত্যা করে ফেললেন।

এ ঘটনার দায়ে উবায়দুল্লাহকে বন্দী করে আনা হল এবং হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হবার পর সর্বপ্রথম এ মোকদ্দমা এসে পড়ল।

হযরত উসমান (রাঃ) নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের নিকট জানতে চাইলেন এ বিষয়ে আপনাদের কি মত? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, শুধুমাত্র আবদুর রহমানের সাক্ষ্যে জাফীনা ও হুরমুজানের অপরাধ প্রমাণিত হয় না। অতএব দণ্ড হিসেবে আবদুল্লাহকে হত্যা করা উচিত। কিন্তু কোন কোন সাহাবী বললেন, কাল উমর (রাঃ) শহীদ হলেন আর আজ তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হবে? তা হতে পারে না।

হযরত উসমান (রাঃ) হুরমুজান ও জাফীনার রক্তপণ নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিয়ে এ বিষয়টি নিষ্পন্ন করেন, কারণ নিহতদের কোন ওয়ারিশ ছিল না এবং তাদের ব্যাপারে খলীফার পূর্ণ এখতিয়ার ছিল।

হযরত উসমান (রাঃ) এর এ ফয়সালা খুব প্রশংসিত হলো।

**পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন**

ইমাম বুখারী রহ. আপন সনদে ইবনে শিহাব যুহরী রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস বিন মালিক রাখি, তাকে বলেন-

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. (খলিফা) উসমানের কাছে হলেন। তিনি আর্মেনিয়া ও জন্য শাম-বাহিনী ও ইরাক-বাহিনীর রণ-প্রস্তুতির কাজে যায় ছিলেন। কুরআন পাঠে বিভিন্নজনদের মতবিরোধের কারছে হুযায়ফা খুব চিন্তিত হন।

তিনি উসমানকে বললেন, আমিরুল মুমিনিন ইহুদি-নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে যাওয়ার পূর্বেই এই উম্মতকে রক্ষা করুন। তখন উসমান রাঃ, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাযি.-এর কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে, (আপনার কাছে। সংরক্ষিত হজরত আবু বকর রাযি.-এর আমলে সংকলিত) সহিফাগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন; আমরা তা কয়েকটি কপি করে নিয়ে মূল কপি আপনার কাছে ফেরত পাঠাব। হাফসা রাখি, সহিফাগুলো খলিফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর খলিফা যায়দ বিন ছাবিত, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র, সাইদ ইবনুল আস ও আবদুর রহমান বিন হিশামকে নির্দেশ দিলে তারা বিভিন্ন মাসহাফে তা কপি করলেন।

উসমান রাঃ, তিন কুরাইশি সদস্যকে বললেন, কুরআনের কোনো বিষয়ে যদি যায়দ বিন ছাবিতের সঙ্গে তোমাদের। মতপার্থক্য হয়, তাহলে তা কুরাইশদের ভাষায় লিখবে। কারণ, কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তা-ই করলেন। যখন তারা মূল লিপিটিকে কয়েকটি কপিতে লিপিবদ্ধ করলেন, তখন উসমান রাযি. মূল লিপি

হাফসা রাযি.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তিনি লিপিবদ্ধ কপিগুলোর এক-একটি ইসলামি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন এবং এগুলো ব্যতীত বিভিন্নজনের কাছে সংরক্ষিত একত্র বা বিচ্ছিন্ন কুরআনের যেসব লিপি রয়েছে, তা পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম বুখারি রহ.-এর উল্লিখিত বর্ণনা হতে এই উসমানি সংকলনের কয়েকটি কারণ নির্ণয় করা যায়। যথা-

অব্যাহত বিজয়াভিযান ও প্রচুর সংখ্যক অনারবের ইসলামগ্রহণ। উমর রাযি, অল্পসংখ্যক সাহাবি ব্যতীত অধিকাংশকেই মক্কা-মদিনা ছাড়া থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপরিচালনায় তাদের পরামর্শ গ্রহণকরতেন। ফলে সেসব অঞ্চলের লোকেরা কুরআনের পাঠ নিয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামি সাম্রাজ্যে নতুন এক ফিতনার অভ্যুদয়ের উপক্রম হয়।

উসমান রাযি, চেয়েছিলেন, সাত কেরাতের মধ্য হতে নির্দিষ্ট এক কেরাতে কুরআন লিপিবদ্ধ হোক। আর তাই তিনি কুরআন যে কেরাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কুরাইশ গোত্রের কেরাতেই লিপিবদ্ধ করান। উল্লেখ্য, অন্যান্য কেরাতে কুরআন পাঠের অনুমতি ছিল সাময়িক; উদ্দেশ্য ছিল যেন এ সময়ের মধ্যে সকলে কুরাইশি কেরাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

এর একটি দৃষ্টান্ত হলো কুরআন সংকলনের সময় সংকলনকমিটি সুরা বাকারার ২৪৮ নং আয়াতের التابوت শব্দটির লিখনরীতি নিয়ে মতানৈক্য করে। যায়দ বিন ছাবিত বলেন, التابوة লেখা হবে, আর কুরাইশি তিনজন বলেন, التابوت লেখা হবে। তারা বিষয়টি খলিফার কাছে উপস্থাপন করলে তিনি التابوت লিখতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'কুরআন তো কুরাইশদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।

নিঃসন্দেহে খলিফা উসমান রাযি.-এর গৃহীত এ পদক্ষেপকে তার খিলাফতআমলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-অবদানরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিদ্যমান সকল সাহাবায়ে কেরাম খলিফার এই পদক্ষেপকে সাদরে গ্রহণ করে নেন।

হযরত আলী রাযি. বলেন, 'লোকসকল, আল্লাহকে ভয় করো। উসমানের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন হতে বিরত থাক। তোমরা বলছ যে, তিনি কুরআন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। শোনো, আল্লাহর শপথ! তিনি কুরআন জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের (সাহাবায়ে কেরামের) সম্মতিতেই।

ইসলাম ও মুসলমানদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতির কারণে বিদ্বেষ ও ক্রোধের অনল যাদের বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছিল এবং কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছিল না, তারা তো পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে আসছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা একে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং একে কেন্দ্র করে মুসলিম জাহানে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়।

## প্রথম ইসলামি নৌবহর প্রতিষ্ঠা

খলিফা উসমান রাযি.-এর আমলে শামে নিযুক্ত গভর্নর বিশিষ্ট সাহাবি মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি. মুসলমানদের জন্য প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খলিফা উমর রাযি.-এর কাছেও নৌবহরের পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন; কিন্তু খলিফা উমর মুসলমানদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তিনি খলিফা উসমান রাযি.-এর কাছে একই পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং বারবার তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানান। অবশেষে ২৮ হিজরিতে খলিফা উসমান রাযি, পরিকল্পনায় সম্মতি দান করেন। নবগঠিত নৌবহর নিয়ে মুয়াবিয়া রাযি, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাইপ্রাসে অভিযান পরিচালনা করেন। পরাজিত সাইপ্রাসবাসী মুসলমানদের জিজিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করে। এ অভিযানে বিশিষ্ট সাহাবি উবাদা বিন ছামিত রাযি.-এর সহধর্মিণী উম্মে হারাম রাযি.-ও অংশগ্রহণ করেন। ফলে নবীজির সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় যে, উম্মে হারাম সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনাকারী প্রথম মুসলিম বাহিনীর সদস্য হবেন। উম্মে হারাম রাযি, সাইপ্রাস-অভিযানেই ইন্তেকাল করেন।

## সাইপ্রাস বিজয়

ইমাম বুখারী রহ. বুখারি শরিফের জিহাদ অধ্যায়ে হজরত আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণনা করেন-

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারাম রাযি.-এর ঘরে দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমান। এরপর নবীজি হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় জাগ্রত হন। উম্মে হারাম হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে নবীজি উত্তর দেন, তিনি স্বপ্নে তার উম্মতের একটি দলকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় দেখেছেন। বাদশা যেভাবে আপন সিংহাসনে আরোহণ করে, তারা সেভাবে সমুদ্রে আরোহী ছিল। এরপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েন এবং (কিছুক্ষণ পর) জেগে ওঠেন। এবারও তিনি প্রথমবারের মতো স্বপ্ন দেখেন। উম্মে হারাম নবীজিকে বলেন, আমার আ আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাকে উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। নবীজি বলেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যে আছ। (অর্থাৎ প্রথম যে বাহিনী সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করবে, তুমি সে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে।
খলিফা উসমান রাযি. এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়া রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন সাইপ্রাস-অভিযানে অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীই ছিল সেই প্রতিশ্রুত বাহিনী। মুয়াবিয়া রাখি, ২৮ হিজরিতে সাইপ্রাস জয় করেন। এই অভিযানে উম্মে হারাম রাযি. তার স্বামী উবাদা বিন ছামিত রাযি.-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং (অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গিয়ে) শাহাদাত বরণ করেন। তার কবর আজও সাইপ্রাসে আছে।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ, বলেন,

(নবীজির স্বপ্নে দেখা) দ্বিতীয় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া। তিনি নৌপথে কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন। উক্ত অভিযানে উম্মে হারাম রাযি, শরিক হতে পারেননি। ....এটি নবুওয়তের সত্যতার অন্যতম মহান দলিল।

৩১ হিজরিতে (৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলিম বাহিনী আবদুল্লাহ বিন আবুস সারহ-এর নেতৃত্বে বর্তমান সুদানের অন্তর্ভুক্ত নুবিয়া অঞ্চল জয় করে। এটি ছিল সে যুগের অন্যতম কঠিন অভিযান। অভিযানে মুসলিম বাহিনী এমন এক অভিনব আক্রমণের মুখোমুখি হয়, যা

মোকাবিলা করে তারা অভ্যস্ত ছিল না। প্রতিপক্ষের সৈনার মুসলিম সৈন্যদের চোখ লক্ষ্য করে অনবরত তির নিক্ষেপ করতে থাকে। এর ফলে যুদ্ধের সূচনাতেই মুসলিম বাহিনীর একশ পঞ্চাশজন সৈন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

আবদুল্লাহ বিন আবুস সারাহ নুবিয়াবাসীর সঙ্গে 'বাকত-চুক্তি' নামক একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা প্রায় ছয়শ বছর কার্যকর ছিল। চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল- (মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) মিশরের সঙ্গে নুবিয়া পরস্পর রাজস্ব বিনিময় করবে এবং উভয়ের মাঝে সব ধরনের সংঘাত-যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

ততদিনে নবগঠিত মুসলিম নৌবাহিনী (গ্রিসের) রোডস (Rhodes) হতে লিবিয়ার) বারকা পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের সুবিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং রোমান উপকূলীয় অঞ্চলেও হুমকি হয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ফলে রোমান শক্তি উপলব্ধি করে যে, নবীন মুসলিম নৌবাহিনীকে এখনই ধ্বংস করতে না পারলে পরিণতি মোটেও ভালো হবে না। তাই রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র তৃতীয় কনস্টান্টাইন (Constantine III) মুসলিম নৌবাহিনীকে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক হাজার নৌযান নিয়ে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ৩৫ হিজরি সনের (৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দের) কথা।

রোমান নৌবহরের মোকাবিলা করতে মুসলিম বাহিনীর শাম-নৌবহর বুছর বিন আরতাত-এর নেতৃত্বে এবং মিশরীয় নৌবহর আবদুল্লাহ বিন আবুস সারহ-এর নেতৃত্বে রওনা হয়। সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পিত হয় বুছর রাযি.-এর এর কাঁধে। মুসলিম বাহিনীর নৌযানের সংখ্যা ছিল দুইশ।এ যুদ্ধের নাম যাতুস সাওয়ারির যুদ্ধ (Battle of the Masts)। যদ্দুর মনে হয়, আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিমে মারসা-মাতরুহ (Mersa Matruh) নগরীর কাছে একটি নৌবন্দরের সন্নিকটে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলিম বাহিনী প্রথমে কৌশলে রোমান বাহিনীকে স্থলযুদ্ধে টেনে আনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু রোমান বাহিনী সমুদ্রেই মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় অটল থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দকে নৌযুদ্ধকে স্থলযুদ্ধে রূপান্তর করার পথনির্দেশ দান করেন। আবদুল্লাহ বিন আবু সারহ তার সৈন্যদের নির্দেশ দেন তারা

যেন শত্রুযানগুলোর কাছে চলে যায়। সেনাপতির নির্দেশে তারা তাদের নৌযানগুলো নিয়ে এত কাছে চলে যায় যে, উভয় পক্ষের নৌযানগুলো পরস্পর গা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তখন একদল মুসলিম সৈন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানিতে নেমে মজবুত রশি দিয়ে রোমান জাহাজগুলোর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর জাহাজগুলো বেঁধে ফেলে। ফলে সমুদ্রবক্ষে বিদ্যমান বারোশ জাহাজ প্রতি দশ-বিশটি একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেন সমুদ্রবুকে একখণ্ড মাটি, যেখানে সংঘটিত হচ্ছে প্রাণপণ লড়াই!

মুসলিম বাহিনী আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় অসাধারণ দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দেয়। এমন প্রচণ্ড ও দীর্ঘ লড়াই হয় যে, ঐতিহাসিক তাবারি রহ. লিখেছেন, এ যুদ্ধে (হতাহতদের রক্তে) পানি রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন।

## ফিতনার আহ্বায়কদের মদিনায় আগমন

ফিতনার আহ্বায়কদের একটি দল ৩৫ হিজরিতে উমরাকারী সেজে মিশর থেকে হিজাযে আগমন করে। তারা হিজাযে পৌঁছায়। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল এক হাজারের মতো। নিজেদেরকে তারা কইয়েকটি দলে বিভক্ত করেছিল।

মিশর থেকে একদল বিদ্রোহী এসেছিল আরেকটি কুফা থেকে, আরেকটি এসেছিল বসরা থেকে।

প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মক্কা- মদিনার পবিত্র ভূমিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। খলিফার সঙ্গে তারা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। খলিফা তাদের প্রতিটি অভিযোগের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করে তাদেরকে নিরুত্তর করে দেন। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে যায়।

## দুষ্কৃতিকারীরা মদীনায়

মদীনাবাসীরা মনে করেছিলেন যে, এ বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তাদের আশ্চর্যের সীমা রইলো না যখন আকস্মিকভাবে দুষ্কৃতিকারীদের ধ্বনিতে মদীনার গলিসমূহ প্রতিধ্বনিত হলো। মিসর, কূফা ও বসরার দুষ্কৃতিকারীদের দলসমূহ হযরত উসমান (রাঃ) এর বাড়ী অবরোধ করলো এবং প্রতিশোধ চাইতে লাগলো। হযরত আলী (রাঃ) মিসরীয়দের নিকট গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা তো মিসরে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলে। আবার ফিরে এলে কেন? তারা বললো, রাস্তায় আমরা একজন বার্তা বাহকের দেখা পেলাম। সে খুব দ্রুত মিসরে যাচ্ছিল। আমরা তাকে তল্লাশি করে তার নিকট আমাদের হত্যার নির্দেশ পেয়েছি। এতে খলীফার সিল রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বসরীয় ও কুফীয়দের জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কেন এলে? তারা জবাব দিল- আমরা আমাদের ভাইদের সাহায্য করতে এসেছি।

হযরত আলী (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, তোমাদের রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন। তোমরা নিজ নিজ রাস্তায় যথেষ্ট পথ অতিক্রম করেছিলে। তারপরেও তোমাদের সাক্ষাত হলো কিভাবে? দুস্কৃতিকারীরা এর কোন উত্তর দিতে পারলো না। হযরত আলী রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, এ সবই তোমাদের চক্রান্ত। দুষ্কৃতিকারীরা বললো, আপনি যাচ্ছে তাই বুঝুন। আমরা উসমান (রাঃ)-কে খলীফা রাখতে চাই না। আল্লাহ আমাদের জন্য এ ব্যক্তির রক্ত হালাল করে দিয়েছেন। আপনিও এ কাজে আমাদের সাহায্য করুন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের সাহায্য করবো না। দুষ্কৃতিকারীরা বললো, তাহলে আপনি আমাদেরকে পত্র দিয়ে কেন ডেকেছেন? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের কোন পত্র লিখিনি। এ উত্তরে দুষ্কৃতিকারীরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

হযরত আলী (রাঃ) যখন দেখলেন যে, পরিস্থিতি তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে এবং দুস্কৃতিকারীরা তাঁকেও এ ঘৃণ্য কাজে জড়াতে চায়, তখন তিনি মদীনার বাইরে আহজারুয যায়ত নামক স্থানে চলে গেলেন।

দুষ্কৃতিকারীরা হযরত উসমান (রাঃ) এর নিকট গেল এবং নির্দেশনামা তাঁকে দেখিয়ে বললো, আপনি আমাদের সম্পর্কে এ পত্র লিখেছেন? হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এ পত্র সম্পর্কে আমার জানাও নেই। দুষ্কৃতিকারীরা বললো, আপনি যদি এ পত্র লিখে থাকেন তাহলে স্পষ্টতঃই আপনি খলীফার যোগ্য নন। আর যদি আপনার পক্ষ থেকে এ পত্র লেখা হয়ে থাকে অথচ আপনার জানা নেই, তাহলেও আপনি খলীফার যোগ্য নন। কেননা যে খলীফার অজ্ঞাতসারে তাঁর পক্ষ থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ খলীফার সিল মোহরসহ জারী করা হবে তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের উপযুক্ত নন। দুষ্কৃতিকারীরা হযরত উসমান (রাঃ) এর নিকট দাবী করলো যে, আপনি খেলাফতের পর থেকে ইস্তফা দিন। হযরত উসমান (রাঃ) এ দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, আমি এ সম্মানের পোশাক যা আল্লাহ আমাকে পরিয়েছে, নিজ হাতে অপসারিত করবো না।'

**অবরোধ**

দুষ্কৃতিকারীরা যখন দেখলো যে, হযরত উসমান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত নন, তখন তারা তাঁর বাড়ী অবরোধ করলো। এ অবরোধ চল্লিশ দিন যাবত স্থায়ী হলো এবং পরস্পর কঠিনতর হতে লাগলো। এমনকি শেষ দিনগুলোতে তাঁর নিকট পানি সরবরাহেও বাঁধা সৃষ্টি করা হলো।

দুষ্কৃতিকারীরা শহরে ঘোষণা করে দিয়েছিলো যে, যে ব্যক্তি ঘরে বসে থাকবে, তাকে কোনরূপ উত্যক্ত করা হবে না। কিন্তু কেউ বাইরে এলে তার মোকাবেলা করা হবে। দুষ্কৃতিকারীদের অভদ্রতা এতই বেড়ে গিয়েছিলো যে,উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে হযরত উসমান (রাঃ) এর নিকট যাবার চেষ্টা করলে তাঁকে জোরপূর্বক বাঁধা দেয়া হলো। এমত পরিস্থিতি দর্শনে অধিকাংশ সাহাবী নিজ নিজ ঘরে অবস্থান নিলেন এবং অনেকে মদীনা ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। তথাপি হযরত উসমান (রাঃ) এর বাড়ী রক্ষার জন্য প্রায় সাত শত লোকের একটি দল উপস্থিত ছিল। এ দলে হযরত হাসান, হুসাইন, হযরত তালহার পুত্র মুহাম্মাদ, হযরত যুবায়েরের পুত্র আবদুল্লাহ, হযরত আবূ হুরায়রা, সাঈদ ইবনে আস, মারওয়ান প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ রক্ষীবাহিনীর সাথে দুস্কৃতিকারীদের কয়েকদফা সংঘর্ষ হয়। মারওয়ান তো

এত জখম হলেন যে, জীবনের আশা রইলো না। হযরত হাসানও কিছুটা জখম হলেন। দুষ্কৃতিকারীরা চাইছিলো যে, কোনমতে মোকাবেলা ব্যতীত হযরত উসমান (রাঃ) কে কাবু করা। তারা জানতো যে, যদি যথার্থ মোকাবেলা হয় তাহলে হাসান হুসাইনের কারণে বনু হাশিম ময়দানে নেমে আসবে।

অবরুদ্ধ অবস্থায়ই তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে হজ্জের আমীর করে মক্কা মুয়াজ্জামার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মক্কাবাসীরা মদীনার পরিস্থিতি অবহিত হোক। এছাড়া ইসলামী প্রদেশসমুহের আমীরদের নিকটেও তিনি দুস্কৃতিকারীদের হাঙ্গামাসৃষ্টির সংবাদ পাঠালেন এবং তাদের সাহায্য কামনা করেন।

## অপূর্ব দৃঢ়তা ও অবিচলতা

অবরোধ যখন দীর্ঘস্থায়ী হলো এবং দুষ্কৃতিকারীদের অত্যাচার বেড়ে গেল, তখন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি মুসলমানদের ইমাম। দুষ্কৃতিকারীদের ষড়যন্ত্রের ফলে আজ আপনার জীবন হুমকির সম্মুখীন। আমি আপনার নিকট তিনটি প্রস্তাব রাখছি। এর যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন। বাইরে বেরিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবেলা করুন। আপনার সাথে জানবাজদের যথেষ্ট পরিমাণ উপস্থিত রয়েছে। তাছাড়াও আপনি সঠিক পথে রয়েছেন। হকের বিজয়ের জন্য মদীনাবাসী আপনার সাহায্য করবে। অথবা সদরদরজা যা দুষ্কৃতিকারীরা ঘিরে রেখেছে, তা ছেড়ে অন্য কোনদিকে পথ করে আপনি মক্কা মুয়াজ্জামায় চলে যান। দুষ্কৃতিকারীদের এ ক্ষমতা নেই যে, মক্কায় আপনার উপর হাত তোলে। অথবা আপনি শামদেশে চলে যান। সেখানে মুআবিয়া (রাঃ) এবং আপনার অন্যান্য সাহায্যকারীরা রয়েছেন।

হযরত উসমান (রাঃ) জবাব দিলেন: প্রথম প্রস্তাবটি আমার নিকট এ জন্য গ্রাহ্য নয় যে, আমি সে প্রথম খলীফা হতে চাই না যিনি নিজ তলোয়ার মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করবেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব এজন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট শুনেছি জনৈক কুরাইশ ব্যক্তি মক্কার অসম্মান করবে এবং গোটা দুনিয়ার আজাবের অর্ধেক তার অংশে পড়বে। আমি চাই না যে, আমি মক্কার অসম্মানের কারণ হই।

তৃতীয় পথ আমি এ জন্য অবলম্বন করতে পারি না যে, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হিজরতস্থান এবং তাঁর প্রতিবেশিত্ব কোন মূল্যে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।

## উসমান রা.-এর মর্মান্তিক শাহাদাত

সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা ভেতরে ঢুকে পড়ে। আমিরুল মুমিনিন তখন ঘরের পুরুষদের অংশে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুর ভয়-ভীতি মুক্ত হয়ে কুরআন মাজিদ সামনে রেখে সূরা-বাকারা তিলাওয়াতে মশগুল ছিলেন। রুমান নামী এক বিদ্রোহী লোহার ভারী রড দিয়ে সজোরে আঘাত করে। আবদুর রহমান গাফিকিও লৌহ অস্ত্র দ্বারা তীব্র আঘাত করে।

অতঃপর 'আল-মাউতুল আসওয়াদ' (কালো মৃত্যু) নামী এক লোক সামনে এগিয়ে আসে এবং পূর্ণ শক্তি দিয়ে উসমান রা.-এর গলা চেপে ধরে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে উসমান রা, কাটা মাছের মতো তড়পাচ্ছিলেন। হতভাগা কোষ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে এবং পূর্ণ শক্তি দিয়ে আঘাত করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। ছিটকে গিয়ে পড়ে কুরআন কারিমের ওপর। রক্তে লাল হয়ে যায় আল্লাহর কালাম فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُ

আরেক দুর্ভাগা বর্শা দিয়ে আঘাত করে। খলিফার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে بسم الله توكلت على الله রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করে গলগল করে।

গৃহের অভ্যন্তরে অন্তঃপুরে নারীদের অংশে এই হত্যাকাণ্ডের আওয়াজ পৌঁছে গেলে স্ত্রী নাইলা ও তার কন্যাগণ চিৎকার করতে করতে খলিফাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন।

নাইলা রা. স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত প্রদর্শনী করেন। স্বামীকে বাঁচাতে তিনি তার ওপরে শুয়ে পড়েন। তখন সুদান ইবনু হুমরান নামী পাপিষ্ঠ তরবারি হাতে সামনে এগিয়ে আসে। নাইলা রা. তরবারির ধারালো অংশ হাত দিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করলে তার আঙুলগুলো কাটা পড়ে।

মিসরের এক বিদ্রোহী তরবারির চোখা মাথা উসমান রা.-এর বুকে চেপে ধরে পুরো শরীরের ভর তরবারির ওপর চাপিয়ে দেয়। বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে তরবারি বেরিয়ে যায় এবং নবীজির জামাতা, তৃতীয় খলিফা, জন্মবাইন সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর পবিত্র শরীরের মাটির পিঞ্জর ছেড়ে রুহ মুবারক মহান রব্বে কারিমের উদ্দেশে যাত্রা করে।দ

إنا لله وإنا إليه راجعون

সময়টা ছিল ৩৫ হিজরির ১৮ই জিলহজ সূর্যাস্তের আগমুহূর্ত। যেন তাকদির লিখে রেখেছিল, দোজাহানের বাদশাহর সাথে মিলিত হয়ে তিনি সেদিনের ইফতার করবেন। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে এতসব। উসমান রা.-কে বাঁচাতে ছুটতে ছুটতে আসে সদ্যআজাদকৃত কয়েকজন গোলাম। তাদের তিনি আজাদ করেছিলেন শর্তারোপ করে, কোনোভাবেই যেন হাতে না ওঠে খুনী তরবারি। তন্মধ্যে একজন সুদান ইবনু হুমরানের ঘাড়ে তরবারির এক প্রচণ্ড কোপ বসিয়ে দেয়। পাপিষ্ঠের ধড় ঘাড় থেকে আলাদা করে দেয়। আরেকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে কুতাইরা নামী বিদ্রোহীকে মৃত্যুর দজায় পৌঁছে দেয়। তৃতীয়জন ঝাঁপিয়ে পড়ে কুলসুম ইবনু তুজাইব নামী বিদ্রোহীর ওপর। সে তখনো মারধর আর গালমন্দ করে যাচ্ছিল খলিফাপত্রী নাইলা রা.-কে। কুলসুমকে সে এক কোপে দুনিয়া ছাড়া করে। অতঃপর অন্যান্য বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে করতে দুজন গোলাম সেখানেই শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

হাঙ্গামার শব্দ শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা., হাসান রা. ও মারওয়ান ইবনু হাকাম পুনরায় ঘরে প্রবেশ করেন। বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করতে করতে তারাও মারাত্মক আহত হন। পরবর্তী সময়ে মদিনাবাসী তাদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

বিদ্রোহীরা ঘরের সমস্ত জিনিস লুণ্ঠন করে। বাসন-কোসন পর্যন্ত বাদ রাখে নি। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাইতুল মালের ওপর। সেখানে চলে লুণ্ঠনের উৎসব। তাদের এই নিকৃষ্টতম কাজই প্রমাণ করে, তারা ছিল দুনিয়ালোভী চোর আর ফিতনাবাজ ডাকাত।

# হযরত আলি রাঃ এর খিলাফত

## জন্ম ও পরিচয়

নাম আলী, উপনাম আ'বুল হাসান ও আবু তোরাব উপাধী হায়দার। পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা। তাঁর বংশ পরম্পরা এইঃ

আলী পিতা আবু তালিব পিতা আব্দুল মুত্তালিব, পিতা হাশিম, পিতা আবদে মানাফ পিতা কুসাই পিতা কিলাব পিতা মূররা পিতা কা'ব পিতা লুআই।

তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর চাচাতো ভাই হরার গৌরব লাভ করেন এবং উভয়ে হাশেমী ছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (সঃ) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার অনেক পোষ্য ছিল। তার সাহায্যার্থে মহানবী (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

## খলিফা হিসেবে আলি রাযি. -এর দায়িত্বগ্রহণ

উসমান রাযি. নিহত হওয়ার পর মদিনা খিলাফতশূণ্য হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের মিশরীয় নেতা গাফিকি বিন হারব-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। মদিনাবাসী এ সময় কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা যদিও খলিফা উসমান রাযি.কে হত্যার প্রশ্নে একজোট ছিল; কিন্তু নতুন খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে তারা মতবিভক্ত ছিল। মিশরীয় বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল আলি রাযি.- এর প্রতি, বসরার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিলো তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি. - এর প্রতি আর কুফার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিলো যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি.- এর প্রতি। কিন্তু তারা তিনজনই বিদ্রোহীদের প্রত্যাখ্যান করায় বিদ্রোহীরা এরপর সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রাযি. - কে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি আরো কঠোর ভাষায় বিদ্রোহীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে ইসলামি

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খলিফার সহায়তায় আগত বাহিনীগুলো মদিনার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে বিদ্রোহীরা মদিনাবাসীকে হুমকি প্রদান করে এবং দুদিন সময় দিয়ে বলে যে, এরমধ্যে মদিনাবাসী নতুন খলিফা নির্বাচিত করতে না পারলে তারা আলি ও যুবায়ের রাযি. - সহ অনেককে হত্যা করবে। এরপর মদিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম সর্বদিক বিবেচনা করে হজরত আলি রাযি.-কেই সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করে তাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। আলি রাযি. তা প্রত্যাখ্যান করলেও সকলে তাকে উম্মাহর এই চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে। অবশেষে ২৫ জিলহজ সকলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। তার বায়আতের সংবাদ সমকালীন ইসলামি বিশ্বের সকল প্রান্তে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলে শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি. ব্যতীত সকলে তার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করে।

## ফিতনা ও ষড়যন্ত্র এবার নতুন রূপে

দায়িত্ব গ্রহণের পর হজরতে আলি রাযি. প্রথমেই ইসলামি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মনোযোগী হন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন গভর্নর প্রেরণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে সকল স্থান থেকে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। আলি রাযি.

শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি. এর কাছে বায়আতের আহবান জানিয়ে বার্তা পাঠালে মুয়াবিয়া রাযি. উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। মুয়াবিয়া রাযি. পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় এবং বিদ্রোহীরা সামনে কী পদক্ষেপ নেয়, তার অপেক্ষা করছিলেন।

এদিকে খলিফা উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকারীরা তাঁর হত্যাকান্ডের পরপরই নিজেদের রূপ পালটে ফেলে। এবার তারা উসমান হত্যার প্রতিশোধের দাবি তোলে। মদিনার আকাশে বাতাসে তখন একটাই আওয়াজ - দ্রুত উসমান হত্যার প্রতিশোধ চাই। দুই বিশিষ্ট সাহাবি তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি. ও যুবায়র বিন আওয়াম রাযি. নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের ভিত্তিতে মদিনাবাসীকে উসমান হত্যাকারীদের ওপর কিসাস প্রয়োগের দাবি

তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই দুই মহান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেননি যে, ষড়যন্ত্রকারীদের দাবির আড়ালে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহকে এক দীর্ঘমেয়াদি ফিতনায় জড়িয়ে ফেলার দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে। এই দুই মহান সাহাবির আহবানে মক্কা-মদিনায় শত শত মানুষ আন্দোলনে প্রস্তুত হয়ে যায়। যেহেতু তখনও মদিনার পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়নি, তাই উসমান-হত্যার প্রতিশোধ ও বিদ্রোহীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা

বসরায় সমবেত হয়। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. ও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

**বসরায় আয়িশা সিদ্দিকা রা.**

বসরার নিকটবর্তী 'খফির' নামক স্থানে পৌঁছে আয়িশা রা.-এর কাফেলা যাত্রাবিরতি করে। আনুমানিক ৩৬ হিজরির মুহাররম মাসের শেষ দশকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। ৭৬৭ মাইল (৪৮ মনজিল বা ১২৩৪ কিলোমিটার) অতিক্রম করে রবিউল আউয়ালের শেষদিকে বসরার উপকণ্ঠে পৌঁছেন। ২৬ দিন বিভিন্ন আলোচনা ও সংলাপে অতিবাহিত হয়। প্রথমে বসরার নেতৃস্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের নামে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের অবগত করা হয়; যাতে কোনো রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। বসরার গভর্নর উসমান ইবনু হুনাইফ রা. নিজেই ইমরান ইবনু হুসাইন রা ও আবুল আসওয়াদ দুআলিকে উম্মুল মুমিনিনের কাছে প্রেরণ করেন। উম্মুল মুমিনিন তাদের সাথে কথা বলেন। তার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ ও বাক্য থেকে ইখলাস ও নিষ্ঠা, কল্যাণকামিতা ও হৃদয়দগ্ধতা সুস্পষ্ট।

তিনি বলেন:

'আমার মতো একজন নারী গোপন কোনো উদ্দেশ্যে এত দীর্ঘ যাত্রা করে না। নিজের সন্তানের কাছে বাস্তবতা লুকানো যায় না। শহরের উদ্ভ্রান্ত লোকেরা ও বিভিন্ন গোত্রের পথচ্যুত শ্রেণী মদিনাতুর রাসুলে আক্রমণ করেছে। আল্লাহ ও তার রাসুলের অভিশাপের যোগ্য তারা। অতঃপর তারা মুসলিমদের রাষ্ট্রপ্রধানকে কোনো অপরাধ কিংবা লুটতরাজাড়াই শহিদ করে দিয়েছে। অবৈধভাবে তাঁকে হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষের

ঘরবাড়ি দখল করেছে, সাধারণ মানুষ অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তারা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না। নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। পরিশেষে অমি উঠে নিড়িয়েছি মুসলিমদেরকে এসব ব্যাপারে সচেতন করার জন্য। ষড়যন্ত্রকারীরা কী ঘনঘোর বিপদ ডেকে এনেছে এবং পেছনে জনসাধারণের কী অবস্থ্। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিমদের করণীয় কী।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

মানুষের বহু গোপন পরামর্শে কোনও কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান সদকা বা কোনও সৎকাজের কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব। [সূরা নিসা: ১১৪।

আমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুম মোতাবেক জাতির সংশোধনের লক্ষ্যে দাঁড়িয়েছি। আমরা তোমাদের সৎকাজের আদেশ দিই ও মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করি। এবং মন্দ কাজের সমাপ্তি ঘটানোর উৎসাহ দিই।

বসরার নেতৃবর্গীয় লোকেরা তালহা ও জুবাইর রা.-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগতি লাভের পর নেতারা আলি রা.-এর হাতে বাইআত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। উত্তরে উভয়ই জানান:
'আলি রা. যদি উসমান রা.-এর হত্যাকারী ও আমাদের মাঝে বাধা হয়ে না দাঁড়ান তাহলে আমরা বাইআতের ওপর অবিচল থাকবো।'

ওদিকে তালহা ও জুবাইর রা.-এর অবস্থান সম্পর্কে জানতে বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ শহরের বাইরে নেমে আসে। মক্কার কাফেলা যেখানে অবস্থান গ্রহণ করেছিল সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। তালহা ও জুবাইর রা. পূর্ণ আবেগ ও জোশ নিয়ে বক্তৃতা করেন। শেষে তারা বলেন, 'মজলুম খলিফার কিসাস গ্রহণ করা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত। হদ কায়েম করার মাধ্যমে সমস্ত

বিশৃংখলার অবসান হবে। হদ কায়েম না করলে আপনাদের শক্তি ও নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় কোনো আইন-শৃংখলা অবশিষ্ট থাকবে না।'

## হযরত আলী (রাঃ) এর ইরাক সফর

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পত্র পেয়ে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বসরা রওয়ানা হবার সংবাদ পেলেন। এখন তিনি শামের উদ্দেশ্য মুলতবী করে ইরাকের উদ্দেশ্য করলেন এবং মদীনাবাসীকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন।

মদীনায় যেসকল নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন তাঁদের জন্য বিষয়টি ছিল খুব জটিল। কেননা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর লড়াই হতে যাচ্ছিল এবং মুসলমানদের তলোয়ার সমূহের নিজেদের মধ্যেই ঝনঝনানি শুরু হচ্ছিল। অতএব বেশ কিছু সংখ্যক আনসার ও মুহাজির খলীফার নিকটে উপস্থিত হয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে এ উদ্দেশ্য থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার তো শুধু সে তলোয়ার প্রয়োজন যা মুসলমান ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আপনি যদি আমাকে সেরূপ তলোয়ার দান করেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গ দানে প্রস্তুত রয়েছি। নতুবা আমাকে ক্ষমা করুন।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি। আমার অন্তর যা মেনে নেয়না, তাতে আমাকে বাধ্য করবেন না।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আদেশ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে মোকাবেলা হবে, আমি আমার তলোয়ার কাজে লাগাবো। আর যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা হবে, তখন আমি তা উহুদের পাথরখণ্ডে আঘাত করে টুকরা টুকরা করে ফেলবো। সেমতে আমি গতকাল তা টুকরা করেছি।

উসামা ইবনে জায়দ (রাঃ) বললেন, আমাকে একাজে অংশগ্রহণ থেকে ক্ষমা করবেন। আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, কোন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু স্বীকারকারীর সাথে লড়াই করবো না।

আশতার নাখঈ এ সকল সাহাবায়ে কেরামের এরূপ কথাবার্তার কথা জানতে পেরে হযরত আলী (রাঃ)-কে বললো, আপনি এদেরকে বন্দী করছেন না কেন? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি তাঁদের মতের বিপরীতে তাঁদেরকে বাধ্য করতে চাইনা।

যাই হোক, হযরত আলী (রাঃ) ইরাকে তাঁর যথেষ্ট সাহায্যকারী মিলতে পারে এবং সেখানকার বায়তুল মাল ধনসম্পদে পূর্ণ এ ধারণায় নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং ৩৬ হিজরীর রবিউস সানী মাসের শেষ দিকে নিজ বাহিনী নিয়ে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তার দলের সদস্যদের সহ হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীতে শামিল ছিল। হযরত আলী (রাঃ) এর পরিকল্পনা ছিল, তিনি তালহা (রাঃ) যুবায়র (রাঃ)-এর পূর্বেই বসরায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু যীকার নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পেলেন যে, হযরত যুবায়র (রাঃ) ও তালহা (রাঃ) বসরা অধিকার করে ফেলেছেন। এখন তিনি সেখানেই ছাউনি ফেললেন।

**কুফাবাসীর সাহায্য কামনা**

বসরা সফরের সময়ে হযরত আলী (রাঃ) কুফাবাসীর সাহায্য লাভের চেষ্টা করলেন। কূফার ওয়ালী ছিলেন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)। তিনি এ গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করছিলেন না। হযরত আলী (রাঃ) প্রথমে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে জাফারকে কূফা পাঠালেন। অতঃপর মালিক ইবনে আশতার ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত আবূ মূসা (রাঃ) ও তাঁর কারণে কুফাবাসী যুদ্ধে উৎসাহিত হলো না। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ)-কে কূফা পাঠালেন। এ দুজন যখন কৃষ্ণা পৌঁছুলেন, তখন হযরত আবূ মূসা (রাঃ) কূফার জামে মসজিদে এক বিশাল জনসমাবেশে নিম্নরূপ বক্তৃতা করছিলেন:

হে কুফাবাসী, আপনারা আমার কথা মেনে নিন। এ সেই ফিতনা যা রসূলুল্লাহ (সঃ) জানিয়ে গিয়েছেন। এ ফিতনার সময়ে বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরস্পর ভাই করেছেন এবং আমাদের জন্য একে অপরের রক্ত ও সম্পদ হারাম ঘোষণা করেছেন। আপনারা নিজ নিজ তলোয়ার কোষবদ্ধ করুন, বর্শার ফলা বের করে ছুঁড়ে ফেলুন, ধনুকের তার কেটে ফেলুন এবং নিজ নিজ ঘরে নির্জনে বসে থাকুন।'

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) এর পর হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ) মিম্বরে এলেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতের ন্যায্যতা, তালহা (রাঃ) যুবায়র (রাঃ) এর অঙ্গীকার ভংগ এবং সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। হযরত হাসান (রাঃ) এর বক্তৃতা শুনে দুদল হয়ে গেল। কা'কা' ইবনে আমর বললেন, 'হে কুফাবাসী আমাদের আমীর আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) যা বললেন, তা তো সত্যি। তবে খেলাফত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকাও প্রয়োজন। যদি এ ব্যবস্থা বজায় না থাকে তাহলে জালেমের প্রতিশোধ ও মজলুমের সহায়তা সম্ভব নয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়ে গিয়েছেন। তিনি আপনাদেরকে সংশোধনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন। আপনাদের এ আহ্বান সর্বান্তকরণে কবুল করে নেয়া উচিত।'

কা'কা'র পর সাইহান ইবনে সওহান নামে কূফার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি একই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এসব বক্তৃতায় সমাবেশের রূপ পাল্টে গেল এবং কূফার নয় হাজার যুবক হযরত আলী (রাঃ) এর সাহায্যের জন্য রওয়ানা হলো। কূফীয়রা যীকার নামক স্থানে এসে হযরত আলী (রাঃ) এর বাহিনীর সাথে মিলিত হলো। হযরত আলী (রাঃ) তাদের খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমি সংশোধনের চেষ্টা করবো। বসরীয়রা যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে ভালো। কিন্তু যদি তারা নিজেদের একগুঁয়েমী পরিত্যাগ না করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে নমনীয় আচরণ করবো এবং সর্বাবস্থায় বিপর্যয়ের চেয়ে সংশোধনকে প্রাধান্য প্রদান করবো।'

## সন্ধি বিফল

পরবর্তীদিন হযরত আলী (রাঃ) নিজ বাহিনী নিয়ে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ)ও নিজেদের বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে বের হলেন। তিনদিন পর্যন্ত দুপক্ষের সৈন্যরা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রইলো এবং সন্ধির কথাবার্তা চলতে থাকলো। হযরত আলী (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) এর নিকট বার্তা পাঠালেন যে, কা'কা'য়ের জবানীতে যেসকল কথাবার্তা হয়েছে, আপনারা যদি তাতে বহাল থাকেন তাহলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত। হযরত তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে আমরা সে বিষয়ে বহাল রয়েছি। অতঃপর এদিক থেকে এ দুজন নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন এবং ওদিক থেকে হযরত আলী (রাঃ) নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করে বের হয়ে এলেন। উভয় পক্ষ এত নিকটবর্তী হলেন যে, দুপক্ষের ঘোড়ার ঘাড় একটির সাথে আরেকটি মিশে গেল।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আপনারা যে আমার বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন, তা কি কোন শরয়ী দালিলের ভিত্তিতে? আপনাদের নিকট কোন দলিল থাকলে বর্ণনা করুন। নতুবা মুসলমানদের সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। আল্লাহকে ভয় করুন। আমি কি আপনাদের দ্বীনি ভাই নই? আমার রক্ত আপনার জন্য এবং আপনাদের রক্ত আমার জন্য হারাম নয় কি? হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, আপনি হযরত উছমান বিরোধী ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি উছমান (রাঃ)এর হত্যাকারীদের অভিশাপ দিচ্ছি। অতঃপর তিনি বললেন, হে তালহা, আপনি কি আমার হাতে বায়আত করেন নি? হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই। তবে এ অবস্থায় যে, আমার গর্দানের উপর তলোয়ার স্থাপন করা ছিল।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর প্রতি মুখ করলেন এবং বললেন, আপনার স্মরণ আছে কি যে, একদিন আমরা দুজনে হাতে হাত ধরে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, হে যুবায়র! তুমি কি কি আলী (রাঃ) কে ভালবাস? আপনি জবাব দিলেন হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ। এতে রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কিন্তু একদিন তুমি আলী (রাঃ) এর সাথে অন্যায়ভাবে লড়াই করবে।

হযরত যুবায়র (রাঃ) বললেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কথা আমার স্মরণ হয়েছে। তাছাড়া হযরত যুবায়র (রাঃ) দেখলেন যে, হযরত আম্মার ইবনে য়াসের (রাঃ) হযরত আলীর বাহিনীতে রয়েছেন। তখন তাঁর রসুলুল্লাহ (সঃ) এর-এ উক্তি স্মরণ হলো যে, আম্মারকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। হযরত যুবায়র (রাঃ) এর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো যে, তাঁর ইজতিহাদী ভুল হয়েছে। তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এ বিবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকলেন।

সন্ধি সম্পাদনে আর কোন সন্দেহ রইলো না। উভয় পক্ষের সন্ধিপ্রিয় লোকেরা সুস্থির হলেন যে, মুসলমানদের তলোয়ারে নিজেদের মধ্যে ঝনঝনানি আর হলো না।

কিন্তু সাবাঈ গোষ্ঠী এ সময় দুরভিসন্ধি পাকাচ্ছিল। রাতে উভয়পক্ষের সৈন্যরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। রাতের আঁধার কেটে না যেতেই সাবাঈ গোষ্ঠী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসলো। উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত যুবায়র (রাঃ) ও তালহা (রাঃ) তাবু থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন এ কিসের শোরগোল? তাদের লোকেরা জবাব দিল, আলী (রাঃ) এর বাহিনী আমাদের আক্রমন করেছে। তখন তালহা (রাঃ) ও যুবায়র (রাঃ) বললেন, পরিতাপের বিষয়, আলী (রাঃ) মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত না করে ছাড়লেন না। আমাদের পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি সন্দেহ ছিল।

ওদিকে হযরত আলী (রাঃ) নিজ সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন এ শোরগোল কেন? সাবাঈরা জবাব দিল, তালহা ও যুবায়রের বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, পরিতাপের বিষয়, তালহা ও যুবায়র (রাঃ) মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত না করে ছাড়লেন না। আমার পূর্ব থেকেই তাঁদের সাথে সন্ধির আশা ছিল না।

## জামাল যুদ্ধ (উটের যুদ্ধ)

পরদিন অকস্মাৎ উভয় বাহিনীর যুদ্ধ বেধে যায়; অথচ যুদ্ধের কোনো আলামতই ছিল না। এই যুদ্ধকে বলা হয় জামাল যুদ্ধ (উটের যুদ্ধ)। যুদ্ধকালীন আয়িশা রা. উটের ওপর আরোহিত ছিলেন। তার চারপাশে চলছিল ঘোরতর যুদ্ধ। এজন্যই এই নামকরণ।

বসরা বাহিনীতে ঢুকে পড়া সাবায়ী চক্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আলি রা.-এর শিবিরের ওপর হামলা করে। অপরদিকে আলি আক্রমণ করে এবং মুষলধারে তীর বর্ষণ শুরু করে। উভয় বাহিনীর প্রত্যেকে ভাবতে শুরু করে, অপরপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে আকস্মিক হামলা করেছে। ফলে উভয় বাহিনীর এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

বিশৃঙ্খলা দেখে তালহা ও জুবাইর রা. কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, 'কুফাবাসী আক্রমণ করে বসেছে।'

বস্তুত, সাবায়িরা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও করে রেখেছিল। আলি বস্তুত এর কাছাকাছি এক ব্যক্তিকে তারা নিযুক্ত করে রেখেছিল; যাতে সে ভুল তথ্য সরবরাহ করতে পারে। ফলে হাঙ্গামা শুনে আলি রা. কারণ জানতে চাইলে তাকে বলা হয়, বসরাবাসী আমাদের ওপর অকস্মাৎ আক্রমণ করেছে।

তারপরও আলি রা. সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করেছেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে লোকজনকে ডেকেছেন, 'লোকসকল, নিজেদের হাত নিয়ন্ত্রণ করো!'

কিন্তু যেসব তরবারি কোষমুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে থামানো যায় নি।

উভয় বাহিনীর চিন্তাশীল লোকেরা সতর্কতা অবলম্বন করে যাচ্ছিলেন। সাইয়িদুনা জুবাইর রা. তীব্র যুদ্ধের মুহূর্তে সাইয়িদুনা আম্মার রা.-এর বর্শার সীমানায় চলে এলে প্রশ্ন করে বসেন, 'আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান?'

আম্মার বলেন, না, আপনি চলে যান।

মোটকথা অনেকেই এভাবে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু সাবায়ি, বিশৃঙ্খলাকারী, নির্বোধ ও অতিউৎসাহী লোক দুদিকেই সক্রিয় ছিল। ফলে আত্মরক্ষার জন্য অনেককেই বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল।

ময়দান ছেড়ে গেলেন জুবাইর রা.

যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করছে দেখে সাইয়িদুনা জুবাইর রা. ময়দান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অনুভব করছিলেন, ভিড়ের ভেতর তার হাতে কোনো মুসলিম নিহত হওয়া অস্বাভাবিক না। ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রা.-কে ডেকে তিনি বলেন, 'আজকের এই যুদ্ধে নিহত প্রতিটি ব্যক্তি হয়তো জালিম হবে অথবা মজলুম হবে। আমি বিশ্বাস করি, মজলুম হিসেবে আমার মৃত্যু হবে। একথা বলেই তিনি যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে চলে যান।

তালহা রা.-এর শাহাদাত

যুদ্ধ শুরুর পরপরই একটি তীর এসে তালহা রা.-এর শরীরে বিদ্ধ হয়। এই তীরের আঘাতেই তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তখন তার বয়স ছিল পঞ্চান্ন বা আটান্ন বছর।

ইমাম বাইহাকি রহ. আল-ইতিকাদে বর্ণনা করেছেন, তীর বিদ্ধ হওয়ার পর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার আগে এক আলাবি সেনার হাতে তিনি বাইআত নবায়ন করে যান। আলি রা. বিষয়টি জানতে পেরে উচ্চৈঃস্বরে তাকবির দিয়ে ওঠেন এবং বলেন, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার মঞ্জুর ছিল যে, তিনি আমার বাইআতবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবেন।'

তেমনিভাবে জুবাইর রা. যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে চলে গেছেন শোনার পর আলি রা. মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর কসম, ভীরুতা-কাপুরুষতার কারণে সে ময়দান ত্যাগ করে নি; তাওবা করে ফিরে গেছে।'

**লড়াইয়ের ময়দানে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা.**

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে বসরার একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন। বসরার বিচারপতি কাব ইবনু সুওয়ার তাকে এই মর্মান্তিক যুদ্ধের কথা অবগত করেন। অনুরোধ কর্তরেন, 'আপনি নিজেই বরং যান। মুসলিমদের তরবারি কোষবদ্ধ করার আদেশ দিন। হয়তো আপনার উসিলায় আল্লাহ তাআলা সন্ধির তাওফিক দেবেন।'

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উটের ওপর আরোহণ করে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন এবং কাব রা.-কে কুরআন কারিমের একটি কপি দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর কিতাব হাতে অগ্রসর হোন। মানুষদেরকে কুরআনের প্রতি আহ্বান করেন।'

কাব ইবনু সুওয়ার কুরআন কারিম খুলে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। কুরআন মাজিদের ওপর সন্ধি করার আহ্বান করেন। সাবায়িরা নির্মমভাবে তীরবর্ষণ করে তাকে শহিদ করে দেয়। অতঃপর খোদ নবীপত্নীর ওপর তীরবর্ষণ শুরু হয়। আয়িশা রা. তখন উটের ওপর হাওদাজে উপবিষ্ট ছিলেন। সুরক্ষার জন্য হাওদাজের চতুর্দিকে বর্ম টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরও আশঙ্কা ছিল ভয়ংকর।নিজের কথা ভুলে মুমিন-জননী তখনো চিৎকার করে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান করে যাচ্ছিলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো। বাবারা, বিচারদিনকে স্মরণ করো।'

কিন্তু উত্তেজিত জনতা শান্ত হচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে আয়িশা রা. দুহাত উঁচু করে উসমান রা.-এর হত্যাকারী ও তাদের সহচরদের বিরুদ্ধে বদদুয়া করতে আরম্ভ করেন। সাথিবর্গ উচ্চৈঃস্বরে আমিন আমিন বলতে থাকে।

আলি রা. এই আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করেন, এটা কীসের আওয়াজ?

জনতা জানায়, উম্মুল মুমিনিন ও তার সাথিরা উসমান রা.-এর হত্যাকারী ও তাদের সহচরদের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিচ্ছেন। আলি রা. নিজেও উচ্চ আওয়াজে বলতে থাকেন, "ইয়া আল্লাহ, উসমানের হত্যাকারী ও তাদের সাথিদের ওপর আপনি গজব পাঠান।"

ইতোমধ্যে যুদ্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল ময়দানের যেখানটায় মুমিন-জননী আয়িশা রা. অবস্থান করছিলেন। নবীপত্নীর সুরক্ষায় আত্মোৎসর্গী বাহিনীর হাত থেকে উটের লাগাম ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল হামলাকারীরা। তাদের উম্মুল মুমিনিনকে নিজেদের কব্জায় নিতে চাইছিল; কিন্তু মুমিন-জননীর চারিধারে আত্মোৎসর্গী পতঙ্গের পরিমাণ কম ছিল না।

তখন পর্যন্ত আয়িশা রা. চাইছিলেন, যুদ্ধ বন্ধ হোক। তালহা রা.-এর যুবক ছেলে মুহাম্মদ উটের লাগাম হাতে নিয়ে বলেন, 'আম্মিজান, হুকুম করেন।' উত্তরে আয়িশা রা. বলেন, 'আদমের দুই পুত্রের মধ্য হতে সুপুত্রটির মতো হয়ে যাও।'

কিন্তু উম্মুল মুমিনিনের ওপর উদ্যত আক্রমণ দেখেও মুহাম্মদ ইবনু তালহা কী করে সরে যেতে পারেন? তিনি পাহাড়ের মত বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং "حم لا يُنْصَرُونَ" (হা-মীম, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না) ধ্বনি দিয়ে লড়তে লড়তে শহিদ হয়ে যান।

অতঃপর আবদুর রহমান ইবনু আত্তাব এবং তারপর আসওয়াদ ইবনু আবিল বুখতারি রহ. লাগাম ধরেন এবং আহত হয়ে পড়ে যান। তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রা.। মুমিন-জননীর উটের লাগাম ধরেন।

এইসময়ে তার শরীরে ছিল পঁয়ত্রিশটি আঘাতের ক্ষত।এমন অবস্থায় তার মোকাবেলা হয় মালিক ইবনু আশতার নাখয়ির সাথে। একজন আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লড়াই করতে করতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সাথিরা এসে দুজনকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

মারওয়ান ইবনুল হাকামও এই যুদ্ধে উম্মুল মুমিনিনকে রক্ষা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের সমপরিমাণ আঘাত প্রাপ্ত হন।

বনু বকর, বনু নাজিয়া ও বনু জাব্বাহের বীর যোদ্ধারা একে একে ঝাঁপিয়ে পড়ে উটের লাগাম হাতে তুলে নিতে থাকে। যে-ই এই দায়িত্ব হাতে তুলে নিতো হামলাকারী সেনারা হাতে আঘাত করে কনুই থেকে তার হাত আলাদা করে দিত। অতঃপর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করত। এভাবে একের পর এক সত্তর জন মর্দে মুজাহিদ মুমিন-জননীর জীবনরক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেন।

বসরার সাবেক বিচারপতি ও বনু জাব্বাহের সর্দার ইবনু ইয়াসরিবি অতুলনীয় বীরত্বের প্রমাণ দেন। তিনি উম্মুল মুমিনিনের সামনে ঘোড়ায় সাওয়ার ছিলেন। প্রথমে হিন্দ ইবনু আমর মুরাদি অতঃপর আকবা ইবনু হাইসাম তার ওপর আক্রমণ করে। ইবনু ইয়াসরিবি তাদের দুজনকেই হত্যা করে ভূপতিত করেন।

যুদ্ধের তীব্রতা দেখে আলি রা. পুত্র হাসান রা.-কে বলেন, 'আজকের পর আর কোন কল্যাণের আশা করা যেতে পারে?'

পুত্র বলেন, 'প্রথমেই আমি আপনাকে নিষেধ করেছিলাম।'

## যুদ্ধের সমাপ্তি

এমন কঠিন মুহূর্তে কাকা ইবনু আমর রা. খলিফাতুল মুসলিমিন আলি রা.-কে পরামর্শ দেন, 'যেকোনো উপায়ে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা.-এর উটকে বসিয়ে দেওয়া হোক; বসরাবাসী কেবল তার নিরাপত্তার জন্য এখনও প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।' প্রস্তাবটি আলি রা.-এর মনঃপূত হয়। বুহাইর ইবনু দুলজা নামি এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কাকা ইবনু আমর রা. সামনে অগ্রসর হন। বুহাইরের ভাই আমর ইবনু দুলজা আয়িশা সিদ্দিকা রা.-এর পক্ষে যুদ্ধরত ছিল। বুহাইর চিৎকার করে ভাইকে ডাকেন। আমর কাছে এলে তারা উভয়ে নিরাপত্তা চান এবং নিরাপদে উট পর্যন্ত পৌঁছে যান। এগিয়ে যেতে যেতে কাকা ইবনু আমর রা. ঘোষণা করেন, 'তোমাদের সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো।'

সুতরাং বসরাবাসীও তিনি হাওদাজের কাছে গিয়ে ডাক দেন, 'হে মুমিন-জননী, উসমান রা.-এর হত্যার দিন স্বয়ং আপনি আমাকে বলেছিলেন আলি রা.-এর আস্তিন আঁকড়ে ধরো। আল্লাহর কসম, এতে সামান্য রদবদলও হয় নি।' আয়িশা রা. নিরুত্তর থাকেন। আবদুল্লাহ ইবনু বুদাইল আদেশ করেন, 'উটের পা কেটে দাও।' তার সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ হুকুম পালন করে। ভূপতিত হওয়ার আগেই মুহাম্মদ ইবনু আবি বকর ও আবদুল্লাহ ইবনু বুদাইল হাওদাজ ধরে ফেলেন এবং উঠিয়ে খলিফা আলি রা.-এর দরবারে নিয়ে আসেন।

পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে আলি রা. উম্মুল মুমিনিনকে হাওদাজ থেকে বের করে আনেন এবং একটি তাঁবুতে পৌঁছে দেন। অতঃপর নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং আরজ করেন, আম্মিজান, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং আপনাকেও। উম্মুল মুমিনিনও উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে ক্ষমা করে দেন।'

আকস্মিক শুরু হওয়া এই যুদ্ধ ছিল এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; আচমকা জ্বলে উঠে সবকিছু ভস্ম করে দিয়ে হঠাৎ করে নিভে যায়।

## সিফফিনের যুদ্ধ

হজরত মুয়াবিয়া রাযি. খলিফা উমর রাযি.-এর শাসনামল হতেই শামের গভর্নর ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পান যে, একদিকে উসমান-হত্যার বিচারের কার্যকর কোন পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না, অপরদিকে বিচারের দাবিদার আন্দোলনকারীগণ বসরায় সমবেত হওয়ার পর উটের যুদ্ধের ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তখন তিনি বায়আতের বিষয়ে আরও বিলম্ব করার সিদ্ধান্ত নেন।

অপরদিকে আলি রাযি.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- যেহেতু তিনি এখন ইসলামি রাষ্ট্রের বৈধ খলিফা এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসন ও জনগণ ইতিমধ্যে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছে, তাই ইসলামি খিলাফতের অধীনস্থ একটি অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কর্তব্য তার বায়আত গ্রহণ করা।

অবশেষে ৩৭ হিজরি সনের মুহাররম মাসে খলিফা আলি রাযি. শামের গভর্নর-পদ হতে মুয়াবিয়া রাযি.-কে অপসারণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযি. খলিফার নির্দেশ

প্রত্যাখ্যান করেন। বাধ্য হয়ে খলিফা আলি রাযি. তার বাহিনী নিয়ে কুফা থেকে মুয়াবিয়া রাযি.-এর মোকাবিলায় রওনা হন। মুয়াবিয়া রাযি.-ও নিজ বাহিনী নিয়ে শাম থেকে বের হয়ে আসেন। ষড়যন্ত্রকারীদের একটি দলও তার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

যুদ্ধের পূর্বে আলি রাযি. নিজ অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ উল্লেখ করে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযি. তা মেনে না নেওয়ায় সমঝোতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সিফফিনের কাছে উভয় বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীর হাতে নিহত হন। নবীজি আম্মার বিন ইয়াসির রাযি.-কে বলেছিলেন—তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

ফলে এতদিন যারা শামি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে শরিক হতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করে চলছিলেন, তার শাহাদাতের পর তাদেরও আর সংশয় থাকল না। এমনিতেই ইরাকি বাহিনীর আক্রমণ অভাবনীয় প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। তখন পর্যন্ত খুযাইমা ইবনু সাবিত রা. তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছিলেন। রাসুলের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী তিনি শুনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আম্মার শহিদ হওয়ার আগপর্যন্ত আমি তরবারি কোষমুক্ত করব না।' আম্মার রা. শহিদ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তরবারি উন্মুক্ত করেন এবং লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান।

আম্মার ইবনু ইয়াসির রা.-এর শাহাদাত মুয়াবিয়া-বাহিনীর সামনে এক কঠিন প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সে সময় শামি বাহিনীর দল ত্যাগ করে আলি রা.-এর বাহিনীতে যোগ দেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জুবাইদ ইবনু আবদ খাওলানি রহ. এবং উমার রা.-এর আজাদকৃত গোলাম হুনাই রহ.।

আমির ইবনু হাযম রা. তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ আমর ইবনুল আস রা.-কে দেন। তিনি ঘাবড়ে যান। মুয়াবিয়া রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আম্মার রা.-এর শাহাদাতের সংবাদ দেন এবং 'বিদ্রোহী বাহিনী'র হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দেন। হাদিসটি প্রমাণ করছিল, আলি রা. আপন ইজতিহাদে হকের পক্ষে আছেন এবং মুয়াবিয়া রা. ভুলের মধ্যে আছেন।

কিন্তু মুয়াবিয়া রা.-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'বিদ্রোহী বাহিনী' দ্বারা উদ্দেশ্য আমরা নই; আমরা তো উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছি। হয়তো তার সামনে রাসুলের ওই হাদিসটি ছিল যেখানে তিনি উসমান রা. সম্পর্কে বলেছিলেন,

'তার পায়ের নিচে (অর্থাৎ তার তিরোধানের পর) এক ফিতনার উদ্ভব হবে। সেসময় যারা তার অনুসারী হবে তারাই হকের পক্ষে থাকবে।'

সুতরাং মূল মর্মকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি আমর ইবনুল আস রা.-কে বলেন:'তাকে কি আমরা হত্যা করেছি? তাকে তো হত্যা করেছে আলি রা. ও তার সাথিরা। তারা তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্শার সম্মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

এটা তো সুস্পষ্ট যে, মুয়াবিয়া রা.-এর এই ব্যাখ্যা বাস্তবে সঠিক নয়; কিন্তু এই ঘটনায় আম্মার রা.-এর শাহাদাতে আমর ইবনুল আস রা. ও মুয়াবিয়া রা.-এর চরম অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, একবার আম্মার রা. কঠিন অসুস্থতার সময়ে বলেছিলেন, 'আমি এই অসুখে মরবো না; প্রিয় রাসুল আমাকে বলে গিয়েছেন, 'দুটি মুমিন দলের মাঝখানে আমাকে হত্যা করা হবে। এভাবে আমার মৃত্যু হবে।' বোঝা যায়, সিফফিনে যুদ্ধরত দুটি দলই ছিল ঈমানদার ও ন্যায় নিষ্ঠাবান।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এর যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন— তাদের নিহত ব্যক্তিরা ও আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতি— বিষয়টি আমার ও মুয়াবিয়ার উপর নির্ভর করবে।

একপর্যায়ে জয়ের পাল্লা আলি রাযি.-এর দিকে হেলে পড়ে এবং মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এ সময় মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীতে থাকা আমর ইবনুল আস রাযি. যুদ্ধ বন্ধ করে সালিশ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দাবি তোলেন। তখন মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীর সৈন্যরা কুরআন উঁচু করে ধরে এবং মধ্যস্থতার দাবি জানায়।

## সালিশ ও মধ্যস্থতা

ইতিহাসের এই অংশটি অত্যন্ত জটিল। সালিশ ও সালিশের ফলাফল নিয়ে নানা ধরনের কথা প্রচলিত আছে। যেমন— আমর ইবনুল আস রাযি. আবু মুসা আশআরি রাযি.-কে ধোঁকা দিয়েছিলেন, তিনি আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রাযি.-এর বরখাস্তের ঘোষণা দিতে আবু মুসা আশআরিকে বাধ্য করেন, এরপর নিজে দাঁড়িয়ে আবু মুসার ঘোষণাকে সমর্থন করেন এবং উভয়ের সিদ্ধান্তের বিপরীতে মুয়াবিয়া রাযি.-এর নামে খিলাফতের ঘোষণা দেন ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো সব মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা, যার একটিও প্রমাণিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো— প্রাচীন ও আধুনিক যেসব লেখক এসব বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তারা সকলেই কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা স্বীকার করেন যে, মুয়াবিয়া রাযি. কখনোই আলি রাযি.-এর খিলাফত নিয়ে আপত্তি বা বিতর্ক করেননি এবং নিজে খলিফা হওয়ার দাবিও করেননি; তিনি কেবল উসমান-হত্যাকারীদের কিসাসের দাবি জানিয়েছেন। তার যুক্তি ছিল, নিহত ব্যক্তির শরয়ি অভিভাবক হিসেবে রক্তপণ দাবি করার অধিকার তার আছে। এটি ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, তৎক্ষণাৎ কিসাস প্রয়োগের দাবির ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদি ভুল করেছিলেন। কারণ, সকলেই এ কথা স্বীকার করে যে, আলি রাযি. কখনোই কিসাস কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানাননি, শিথিলতা বা অবহেলাও প্রদর্শন করেননি।

আলি রাযি.-এর যুক্তি ছিল— সমস্যা তাতে এখন আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। খোদ ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী মদিনাই এখন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। এ কারণেই আমিরুল মুমিনিন আলি রাযি. তালহা রাযি. ও জুবায়র রাযি.-কে বলেছিলেন, 'আমরা এমন একদল লোকের বিরুদ্ধে কীভাবে (এখনই) পদক্ষেপ গ্রহণ করব, যারা আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে; অথচ তাদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই?'

এরপর তিনি বলেন,

'এভাবে খুনের বদলার দাবিতে আন্দোলন করা একটি জাহিলি রীতি। আপনারা শান্ত হোন; ধীরে ধীরে সকলে শান্ত হয়ে যাবে এবং সবার হৃদয়- অবস্থান স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তখন হত্যার কিসাস গ্রহণ করা হবে।'

হজরত আমর ইবনুল আস রাযি. ও আবু মুসা আশআরি রাযি.-কে মধ্যস্থতাকারী নির্ণয় করা হয়। উভয়ে সিদ্ধান্ত জানান— আলি রাযি.-এর খিলাফতের দায়িত্ব থাকবে। এবং আলি রাযি. তার অধীনস্থ অঞ্চলের দেখাশোনা করবেন আর শামের দায়িত্ব থাকবে মুয়াবিয়া রাযি.-এর হাতে।

**খারিজি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ**

হযরত আলি (রা.)-এর বাহিনীর একটি অংশ (প্রায় ১২ হাজার সৈন্য) সালিশ বা মধ্যস্থতার মূল প্রক্রিয়াটিকে প্রত্যাখ্যান করে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আশ্চর্যজনক

বিষয় হলো, এর আগে তারাই হযরত আলি (রা.)-কে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করেছিল।

দল থেকে আলাদা হয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কারণে তারা খলিফা হযরত আলি (রা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ) 'কাফির' বলে ঘোষণা করে।এই বিচ্ছিন্ন দলটি কুফায় পৌঁছে 'হারুরা' নামক একটি গ্রামে অবস্থান নেয়। এই কারণে প্রথম দিকে তাদের 'হারুরিয়া' বলা হতো। তবে ইতিহাসে তারা মূলত 'খারিজি সম্প্রদায়' (দলছুট বা দলত্যাগী) নামে পরিচিত।

হযরত আলি (রা.) এবং অন্যান্য ফকিহ (ইসলামি আইনজ্ঞ) সাহাবিগণ তাদেরকে শরিয়তের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা ছিল চরম নির্বোধ প্রকৃতির বেদুইন গোষ্ঠী। কোনো যুক্তিতর্ক বা আলোচনার মানসিকতা তাদের ছিল না। তারা সাধারণ মানুষকে সালিশের বিষয়ে জিজ্ঞেস করত; কেউ সালিশের পক্ষে কথা বললেই তাকে 'মুরতাদ' ও 'কাফির' গণ্য করে হত্যা করত।

খারিজি দমন ও পরবর্তী রাজনৈতিক চুক্তি

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ: দলিল-প্রমাণ ও আলোচনার মাধ্যমে খারিজিদের সুপথে আনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে, ৩৮ হিজরিতে হযরত আলি (রা.) তাদের দমনে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধে বহু খারিজি নিহত হয় এবং অনেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে এই খারিজিরা বিভক্ত হয়ে প্রায় ২০টি উপদলে পরিণত হয়।

আলি-মুয়াবিয়া চুক্তি: ৩৯ হিজরিতে হযরত আলি (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, মুয়াবিয়া (রা.) শামের (সিরিয়া) গভর্নর থাকবেন এবং আমিরুল মুমিনিন হযরত আলি (রা.) শামের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।

## তিন মহান সাহাবিকে হত্যার চক্রান্ত

৪০ হিজরিতে খারিজিরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিন মহান ব্যক্তিত্বকে একসাথে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। তাদের দৃষ্টিতে এই তিনজনই অপরাধী ছিলেন। এই তিনজনকে হত্যা করতে তিনজন গুপ্তঘাতককে দায়িত্ব দেওয়া হয়:

হযরত আলি (রা.)-কে হত্যার দায়িত্বে: আব্দুর রহমান বিন মুলজিম।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে হত্যার দায়িত্বে: বুরাক বিন আব্দুল্লাহ।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে হত্যার দায়িত্বে: আমর বিন বকর তামিমি।

সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৭ রমজান ফজর নামাজের সময় এই তিন গুপ্তঘাতক একযোগে তিনজনকে হত্যা করবে। কিন্তু বাস্তবে কেবল একজনই তার মিশন সফল করতে পেরেছিল।

**খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর শাহাদাত**

৪০ হিজরির ১৭ রমজান (২৪ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) খলিফা হযরত আলি (রা.) প্রতিদিনের অভ্যাসমতো সবাইকে ফজরের নামাজের জন্য জাগ্রত করতে ঘর থেকে বের হন। কুফা মসজিদের দরজায় ওত পেতে থাকা খারিজি গুপ্তঘাতক আব্দুর রহমান বিন মুলজিম তাঁর ওপর তরবারি দিয়ে মারাত্মক হামলা চালায়।

খলিফার প্রতিক্রিয়া: আহত অবস্থায় খলিফা চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'কাবার রবের শপথ! আমি সফলকাম!'

জনতা দ্রুত ঘাতককে ধরে ফেলে। মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলি (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঘাতকের ব্যাপারে কী করা হবে। তিনি অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ উত্তর দেন: "যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে করণীয় আমিই নির্ধারণ করব। আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে করণীয় নির্ণয়ের অধিকার তোমাদের। তোমরা যদি কিসাস (রক্তের বদলে রক্ত) গ্রহণের সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে এক আঘাতের পরিবর্তে এক আঘাতই করবে; আর যদি তাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা-ই তাকওয়ার নিকটতর দাবি।"

এই মারাত্মক আঘাতের পর, ৪০ হিজরির ২১ রমজান (২৮ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ) মাত্র ৬৩ বছর বয়সে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.) কুফায় ইন্তেকাল করেন।

বাকি দুই সাহাবির পরিণতি (একই সময়ে যা ঘটেছিল)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.): শামে বুরাক বিন আব্দুল্লাহ তাঁর ওপর আক্রমণ চালালেও লক্ষ্যভ্রষ্ট আঘাতের কারণে তিনি আহত হন এবং পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.): মিশরে ঘাতক আমর বিন বকর ওত পেতে থাকলেও, সেদিন অসুস্থতার কারণে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মসজিদে যাননি। তাঁর

পরিবর্তে তিনি খারিজা বিন হুযাফা (রা.)-কে ইমামতি করার জন্য পাঠান। ঘাতক তাকেই আমর ইবনুল আস মনে করে ভুলবশত হত্যা করে।

## খিলাফতে রাশেদার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

খিলাফতে রাশেদার রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি-কৃষ্টির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছিল। এটি একাধারে ছিল দীন-ভিত্তিক ও জাগতিক উন্নয়নের একমাত্র নিয়ামক রাষ্ট্র। দীন-ইসলামের ওপরই এর ভিত্তি স্থাপিত ছিল এবং কুরআনের অকাট্য মূলনীতি ও রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত অনুযায়ী মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনই ছিল এর যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য।

খিলাফতে রাশেদার আমলে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী যাবতীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা হতো। খুলাফায়ে রাশেদুন যদি এমন কোনো সমস্যা বা জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতেন, যার প্রত্যক্ষ মীমাংসা কুরআন ও হাদীস থেকে লাভ করতে পারতেন না, তাহলে নবী করীম (স)-এর কার্যাবলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সামনে রেখে উত্তমভাবে তার মীমাংসা করে নিতেন এবং কোনো দিক দিয়েই কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মৌলিক আদর্শ লঙ্ঘিত হতে দিতেন না।

ইসলামের মৌলিক বিধান অনুসারে গোটা মুসলিম উম্মাহ খলীফাদের আনুগত্য স্বীকার করে চলতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই মূলনীতিও সবচেয়ে বেশি সমর্থিত ছিল যে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম-বিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো খলীফা বা রাষ্ট্রকর্তার আনুগত্য করা যেতে পারে না। কুরআন-হাদীসের মূল সূত্র থেকে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন-কানুন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে খলীফার কোনো প্রাধান্য, বিশিষ্টতা ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে খলীফা বরং অন্যান্য সাহাবীদের কাছে কুরআন-হাদীস-ভিত্তিক রায় বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতেন। এই ব্যাপারে খলীফাদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ারও পূর্ণ অধিকার ছিল। শুধু তাই নয়, খলীফাদের রায়ের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া এবং তাদের প্রকাশ্য সমালোচনা করার সাধারণ অধিকারও সর্বতোভাবে স্বীকৃত ছিল।

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় বা সম্মতির অনুযায়ী খলীফা নির্বাচিত হতেন। জোরপূর্বক কিংবা বংশানুক্রমিক ধারা অনুযায়ী খলীফার পদ দখল করা শুধু ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থারই পরিপন্থী নয়, ইসলামী বিধানের দৃষ্টিতে তা মারাত্মক অপরাধও বটে।

খুলাফায়ে রাশেদুনের মধ্যে বাদশাহী শান-শওকত কিংবা ডিকটেটরী স্বৈরতন্ত্রের কোনো অস্তিত্বই বর্তমান ছিল না। তাঁরা নিজেদেরকে নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতেন। একমাত্র খিলাফতের দায়িত্ব ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়েই তাঁদের ও সাধারণ জনগণের মধ্যে একবিন্দু পার্থক্য ছিল না। খলীফার দরবারে সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং এই ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার অবকাশ ছিল না। এই কারণে জনগণের সাধারণ অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং কোন প্রকার দীর্ঘসূত্রতা ছাড়াই তার প্রতিকার করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল। এই কারণেই এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা যেতে পারে যে, খিলাফতে রাশেদাই হচ্ছে বিশ্ব-ইতিহাসে একমাত্র ও সর্বপ্রথম রাষ্ট্র, যেখানে প্রকৃত গণ-অধিকার পুরোপুরিভাবেই রক্ষিত হয়েছে।

**বিচার বিভাগ**

খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা খলীফার অন্যতম দায়িত্ব মনে করা হতো। এইজন্য প্রথম দিকে তাঁরা প্রায় সব বিচারকার্য নিজেরাই সম্পন্ন করতেন। অবশ্য দূরবর্তী স্থানসমূহের জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। প্রথম খলীফার আমলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিযুক্ত শাসনকর্তাই বিচার কার্য আঞ্জাম দিতেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলীফা তাঁর খিলাফত আমলে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করে দিয়েছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক শহরেই স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন বিচারপতি বা কাজী নিয়োগ করা হয়েছিল। বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। বিচারপতি রায়দানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খলীফার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে এই নির্দেশ দান করা হতো যে, তাঁরা বিচারে যে রায়ই দান করবেন, তা যেন সর্বতোভাবে কুরআন ও সুন্নাতে-রাসূলের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। কোনো দিক দিয়েই যেন তা লঙ্ঘন করা না হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার শাসনকর্তা বিচারপতির ওপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে কিংবা প্রভুত্ব খাটাতে পারতেন না। কাজী বা বিচারপতি সরাসরি খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সংশ্লিষ্ট শহরের শাসনকর্তাকেও অনেক সময় বিচারপতি নিয়োগের ইখতিয়ার দান করা হতো; কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজী বা বিচারপতি কখনই শাসনকর্তার অধীন হতেন

না। এছাড়া বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। চতুর্থ খলীফার প্রদত্ত একখানি নিয়োগপত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

লোকদের মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করার জন্য এমন সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়োগ কর, যাদের রায় জনগণ অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেবে এবং কেউ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কোনো সাহস বা প্রয়োজন বোধ করবে না। তাঁরা হবেন সব প্রকার লোভ-লালসা ও মোহ-মাৎসর্য থেকে পবিত্র। তাঁরা কারো বিশেষ মর্যাদার কারণে সন্ত্রস্ত ও প্রভাবান্বিত হবেন না। সকল ব্যাপারেই তাঁদেরকে গভীর-সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বশীল হতে হবে। সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ ব্যাপারে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক হবেন। পক্ষদ্বয়ের উপস্থাপিত যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও সাক্ষ্য দর্শনে কিছুমাত্র ঘাবড়ে যাবেন না, প্রতিটি ব্যাপারের গভীর তলদেশে পৌঁছার জন্য পরিপূর্ণ সতর্কতা ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কাজ করবেন। এইভাবে তাঁরা কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছালে তা পুরোপুরি দৃঢ়তার সাথে কার্যকর করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। কোনো প্রকার সুপারিশ ও কোনরূপ পদ-মর্যাদাকেই তাঁরা ফয়সালা কার্যকর করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেবেন না। যদিও এই ধরনের লোকদের সংখ্যা বেশি হয় না কখনো, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচারপতিকে অবশ্যই উল্লেখিত গুণে ভূষিত হতে হবে। তোমরা যখন কাউকেও বিচারপতি নিযুক্ত করবে, তখন তার যথেষ্ট পরিমাণে বেতন ধার্য করবে; তা হলে তার জীবনযাত্রা নির্বাহের দাবি তাকে ঘুষ নিতে বাধ্য করবে না। উপরন্তু তোমাদের মন-মানস ও সমাজ-সম্মেলনে তার মর্যাদা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার সাহস কারো না হয়।

বিচারকগণ ছাড়াও প্রত্যেক শহরেই ইসলামী আইন সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী সব সময়ই মজুদ থাকত। কোনো ব্যাপারে বিচারকদের অসুবিধা বা সমস্যা দেখা দিলে এঁদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হতো।

এই সময় নবী করীম (স)-এর হাদীসসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল লোকদের স্মৃতিপটে রক্ষিত। কেউ একটি হাদীস জানত, আর কারো স্মরণ ছিল অন্য একটি হাদীস। সমস্ত হাদীস এককভাবে বিশেষ কারো স্মরণে ছিল না আর ইহাই ছিল সেকালের একটি কঠিন সমস্যা। বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত ব্যাপারের মীমাংসা করার জন্য কোনো হাদীসের প্রয়োজন হলে তাঁরা বিভিন্ন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ বা কর্মনীতি জানতে চেষ্টা করতেন।

ফলে তাঁরা রাসূলের যে হাদীসই পেতেন, সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করতেন; কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো হাদীস পাওয়া না গেলে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা ও তার ধারাকে সম্মুখে রেখে তাঁরা ইজতিহাদ করতেন। এই কারণে অনেক সময় কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে বিচারকদের রায় বিভিন্ন প্রকার হতো। বিচারকদের ফয়সালাসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখার তখনও শুরু হয় নাই। ফলে পরবর্তীকালের লোকেরা তা থেকে কিছুমাত্র ফায়দা লাভ করার সুযোগ পেত না।

এই যুগের যাবতীয় বিচার কার্য কেবলমাত্র ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেবলমাত্র শরীয়াতের খুঁটিনাটি আইন জানবার ও যুগের বিশেষ অবস্থা ও ঘটনার উপর তাকে প্রয়োগ করার ব্যাপারেই ইজতিহাদ-নীতি ব্যবহার করা হতো। স্মর্তব্য যে, ইসলামী আইনসমূহ ছিল কতগুলি মূলনীতির সমষ্টি; তার খুঁটিনাটি বিধান তখনো রচিত হয় নাই। বস্তুত চিরকাল ও সমগ্র মানবতার জন্য প্রদত্ত আইন-বিধান এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কালের প্রতিটি পর্যায়ে ও পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলেই তার বাস্তব প্রয়োগ কেবলমাত্র এই ভাবেই সম্ভব ও সহজ হতে পারে।

বিচারক নিয়োগের পরও জনগণের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার ব্যাপারে খলীফাদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাই অনেক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। সেইসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিচারকগণ শুধু খলীফাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন মাত্র।

**দেশরক্ষা বিভাগ**

খিলাফত আমলে যুদ্ধ বা সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মূল ক্ষমতা খলীফার হস্তেই নিবদ্ধ থাকত। কেননা নবী করীম (স)-এর জামানায়ও এই রীতিই কার্যকর ছিল। তিনি নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শাসন পরিধি যখন বিশালতর হতে লাগল, তখন খলীফাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও পৃথকভাবে সেনাধাক্ষের নিয়োগ শুরু হলো। তাকে মেনে চলা স্বয়ং খলীফাকে মেনে চলার মতোই অবশ্যই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের অবসান হলে সামরিক ব্যাপারসমূহ পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে ট্রেনিং দান করাই ছিল সেনাধাক্ষদের একমাত্র কাজ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে সমগ্র সৈন্যবাহিনী অবৈতনিক ও স্বেচ্ছামূলক ছিল। কোনো রেজিস্ট্রী বইতে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল না। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফত কালেই সৈন্য বিভাগ সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে গঠিত হয় ও

প্রতিটি সৈনিকের নাম রেজিস্ট্রীভুক্ত হয়। এর ফলে সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। কোনো সৈনিক পলায়ন করলে কিংবা পশ্চাতে থেকে গেলে অতি সহজেই তা ধরা পড়ত। পলাতক সৈনিকদের জন্য তখন একটি বিশেষ ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। পলাতককে নিজ মহল্লার মসজিদে তার নাম প্রকাশ ও প্রচার করে ঘোষণা করা হতো যে, এই ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছে; আল্লাহর পথে আত্মদান করার ব্যাপারে সে কুণ্ঠা প্রদর্শন করেছে। বস্তুত এতটুকু ভর্ৎসনা আরবদের জন্য মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও মারাত্মক ছিল। কেননা সমগ্র বিশ্ব-জাতির মাঝে আরবদের যে অতুলনীয় বীরত্ব ও বিস্ময়কর সাহসিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল, তাতে কোনো ব্যক্তিকে অপৌরুষ ও ভীরুতার দায়ে অভিযুক্ত করা এবং প্রকাশ্যভাবে উক্তরূপ ঘোষণা দেওয়া মৃত্যুর অপেক্ষাও অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সমাজে মুখ দেখাবার কোনো স্থান আর অবশিষ্ট থাকত না।

হযরত উমর (রা) সমস্ত সৈনিকদের জন্য বায়তুলমাল থেকে বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এই বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না। ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যই ছিল মুজাহিদদের বেতন নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। অবশ্য শেষ পর্যায়ে হযরত আলী (রা) এই পার্থক্যও খতম করে দিয়ে সকলের জন্য সমান মানের বেতন চালু করেছিলেন।

ইসলামী বাহিনীতে প্রত্যেক দশজন সৈনিকের উপর একজন 'প্রধান' নিযুক্ত হতো। আরবী সামরিক পরিভাষায় তাকে বলা হতো 'আরীফ'। এই আরীফদের হস্তেই সকল সৈনিকদের বেতন অর্পণ করা হতো; তারা তা অধীনস্থ সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিত।

সৈন্যবাহিনী সংগঠনের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবগণ শত্রুপক্ষকে কখনো সারিবদ্ধভাবে আর কখনো বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হতো। প্রথমে উভয় পক্ষ থেকে এক-দুইজন বীরপুরুষ সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হতো, তারপর সাধারণ হামলা পরিচালিত হতো এবং শেষ পর্যন্ত এলোমেলোভাবে আক্রমণ ও অস্ত্র পরিচালনা করা হতো। মুসলমানগণও ইসলামী জিহাদের প্রথম পর্যায়ে এই রীতিরই অনুসরণ করছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তারা যখন পারস্য ও রোমানদের সুসংগঠিত সৈন্য বাহিনীর মুখোমুখি হতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারলেন যে, আধুনিক পদ্ধতিতে এই সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ও সমর নীতির মোকাবিলা করতে হলে প্রাচীন রীতি অবশ্যই

পরিহার করতে হবে। অতঃপর তাঁরা নূতনভাবে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন ও সম্পূর্ণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে সারিবদ্ধ করা হতে লাগল, কেহ অগ্রে বা পশ্চাতে পড়ে থাকত না। গোটা সৈন্যবাহিনীকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হতো। সকলের অগ্রবর্তী বাহিনীকে বলা হতো 'মুকাদ্দামা', যুদ্ধের সূচনা করাই ছিল এর দায়িত্ব। মধ্যবর্তী বাহিনীকে বলা হতো 'কলব', মূল সেনাধ্যক্ষ ইহাদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকতেন। ডান পার্শ্বে স্থাপিত বাহিনীকে বলা হতো 'মায়মানা' এবং বাম পার্শ্বে অবস্থিত 'মায়সারা'। আর সকলের পশ্চাতে অবস্থিত বাহিনীর নাম দেওয়া হতো 'সাকাহ'।
যে সৈন্যবাহিনী এই পাঁচটি উপ-বাহিনীতে বিভক্ত হতো, তাকে 'খামীস' বলা হতো। এর প্রত্যেক অংশেরই একজন করিয়া 'আমীর' হতেন এবং তিনি মূল সেনাধ্যক্ষের ফরমান অনুসারে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করতেন। অশ্বারোহী বাহিনীর আমীর হতেন স্বতন্ত্র। পশ্চাদ্দিক সংরক্ষণের জন্য মুসলিম সৈনিকগণ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, যেন শত্রু-সৈন্য কোন সুযোগেই পশ্চাদ্দিক হতে তাদের উপর হামলা করতে সমর্থ না হয়। নৈশকালীন আক্রমণ হতে গোটা বাহিনীকে হেফাজত করার জন্য তাঁরা বিশেষ ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতেন। মুসলমানদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ ছিল সর্বাধিক সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধভাবে সক্রিয়। সেই কারণে শত্রুদের অধিকাংশ গোপন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তাঁরা পূর্বাহ্নেই জানতে পারতেন।

**রাজস্ব বিভাগ**

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কাল হতে রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ও স্থানীয়ভাবে লোক নিয়োগ করা হতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সাধারণতঃ অর্পণ করা হতো না। আদায়কৃত রাজস্ব খলীফার নির্দেশ অনুসারে সৈনিকদের বেতন-ভাতা ও জনকল্যাণমূলক অন্যান্য সর্বজনীন কাজকর্মে ব্যয় করা হতো। উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।
খিলাফত আমলে দুই প্রকারের রাজস্ব ধার্য করা হতো: (১) স্থায়ী ও (২) অস্থায়ী। স্থায়ী রাজস্বের মধ্যে যাকাত, উশর ও জিজিয়া উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে গনীমতের মাল ছিল অস্থায়ী রাজস্ব বা রাষ্ট্রীয় আয়।

## খারাজ

সাধারণতঃ যুদ্ধ-জয়ের ফলে অধিকৃত দেশের যাবতীয় চাষযোগ্য জমি তার পূর্বতন মালিকদের নিকটই থাকতে দেওয়া হতো। অবশ্য উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব বাবদ আদায় করা হতো। একেই ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'খারাজ'। একে ভোগ্য জমির খাজনা মনে করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার জমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মুদ্রা কর-বাবদ ধার্য করা হতো।

## উশর

যেসব জমির মালিকগণ ইসলাম কবুল করত অথবা বিজয়ী মুসলমানরা যেসব জমির মালিকদের নিকট হতে জিজিয়া আদায় করতেন না, সেই জমিকে বলা হয় উশরী জমি এবং তার ফসলের এক দশমাংশ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ সরকারি ব্যবস্থাপনায় আদায় করা হতো। মুসলমানগণ বল প্রয়োগ বা যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব জমি দখল করতেন, তাহা 'উশরী' জমি নামে অভিহিত হতো এবং তাহা কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হতো। ফলে তাহা মুসলমানদেরই দখলভুক্ত হইয়া থাকিত। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন সিরিয়া ও ইরাক অধিকৃত হয়, তখন তিনি বিজিত জমি সম্পর্কে উপদেষ্টাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তার বিলি-ব্যবস্থা কি ভাবে করা হবে? অধিকাংশ লোকই জমিগুলিকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

হযরত উমর (রা) বলেছিলেন: 'তাহা হইলে তো ভবিষ্যৎ বংশধরদের হক নষ্ট করা হইবে। কেননা, বর্তমানে জমিসমূহ বণ্টন করিয়া দিলে অনাগত মানুষদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।' উহাতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলিলেনঃ জমি ও দাস-দাসী তাহারাই পাইবার অধিকারী, যাহারা নিজেদের বাহুবলে দেশ জয় করিয়াছে; অন্য লোকদের তাহাতে কি অধিকার থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে খলীফা উমর ফারুক (রা) বলিলেনঃ 'একথা ঠিক, কিন্তু মনে রাখিও আমার পর খুববেশী দেশ জয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না বলিয়া তখন মুসলমানদের পক্ষে অধিক পরিমাণ মাল-দৌলত ও জমি লাভ করা সম্ভব হইবে না। উত্তরকালে বরং অনেক দেশজয় কল্যাণের পরিবর্তে দুর্বহ বোঝার কাজই করিবে বেশী। ইরাক ও সিরিয়ার জমি উহার মালিকদের

নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ও বিজিত লোকদেরকে ক্রীতদাস বানাইয়া বিজয়ী মুসলমানের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে সীমান্তের সংরক্ষণ ব্যবস্থা কিরূপে কার্যকর হইবে? কেননা মুসলমানগণ তো কৃষিকাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। এতদ্ব্যতীত ইয়াতীম ও অসহায় বিধবাদের ভরণ-পোষণের কাজও অসমাপ্তই থাকিয়া যাইবে'।

খলীফা উমর ফারুক (রা)-এর এই ভাষণ শ্রবণ করার পর সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেনঃ "আপনার মত বাস্তবিকই সঠিক ও নির্ভুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সীমান্তে ও শহরে যদি সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত না থাকে, তাহা হইলে এইসব এলাকা সংরক্ষণ করার কোনই ব্যবস্থা থাকিবে না এবং ইসলামের দুশমনগণ পুনরায় এই শহরগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিবে।"

হযরত উমর বলিলেনঃ এই ব্যাপারটি তো পরিষ্কার হইয়া গেল। এখন আমার এমন একটি লোকের প্রয়োজন, যিনি খারাজ নির্ধারণের জন্য সমগ্র ইরাকের জরীপ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।' অতঃপর উমরান ইবনে হানীফকে এই কাজে নিযুক্ত করা হইল। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে এই কাজ সম্পন্ন করিলেন এবং হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাত লাভের এক বৎসর পূর্বেই সওয়াদে কুফা হইতে আদায়কৃত খারাজের পরিমাণ এক কোটি মুদ্রা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

সিরিয়া বিজয়ের পরও সৈনিকদের পক্ষ হইতে অধিকৃত জমি সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়। কিন্তু তখনও হযরত ফারুক ফারুক আজম (রা) উক্তরূপ জওয়াব দিয়া সকলকে নিরস্ত করেন। ফলে ইরাকের ন্যায় সিরিয়ার ভূমি হইতেও বিপুল পরিমাণ খারাজ সরকারি খাজাঞ্চীতে সঞ্চিত হইতে থাকে।

বস্তুতঃ বিজিত এলাকার জমিক্ষেত বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া পুরাতন বাসিন্দাদের দখলে উহা থাকিতে দেওয়া এবং তাহাদিগকে উহার চাষাবাদ করার সুযোগ দিয়া তাহাদের নিকট হইতে খারাজ আদায় করা সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর অভিমত অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। তখন এইরূপ ফয়সালা গৃহীত না হইলে মুসলিম জাতি তাহার আসল দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া ক্ষেত-খামার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িত এবং সামরিক দক্ষতা হারাইয়া ফেলিত। দ্বিতীয়তঃ সেই এলাকার সংরক্ষণকারী ও অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলে যুদ্ধলিপ্ত ইসলামী সৈনিকদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহেরও কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত না। আর ইহাই হইত সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও অপূরণীয় ক্ষতি। কেননা, এই সুযোগে পারসিক ও রোমক সর্দার যারা নিজেদের দেশের উপর মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছিল তাহারা

পুনরায় নিজেদের দেশ দখল করিয়া বসিতে পারিত ও মুসলমানদের উপর প্রবলভাবে আক্রমণ চালাইত।

**জিজিয়া**

ইসলামী খিলাফতে যিম্মিদের (অমুসলিম অনুগত নাগরিকদের) নিকট হইতে তাহাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ ও উহার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে অর্থ গ্রহণ করা হইত, ইসলামী পরিভাষায় উহাকে 'জিজিয়া' বলা হয়। ইহা কেবলমাত্র বয়স্ক ও সুস্থ-সবল পুরুষদের নিকট হইতেই আদায় করা হইত। নারী, শিশু, দরিদ্র ও পঙ্গুদের উপর ইহা ধার্য করা হইত না। হযরত উমর (রা) বহু দরিদ্র যিম্মির জন্য বায়তুলমাল হইতে বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছিলেন। 'জিজিয়া' ধার্য করা হইত ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উহার পরিমাণ ১২ দিরহামের কম ও ২৮ দিরহাম অপেক্ষা বেশী হইত না। হযরত উমর (রা) তাঁহার পরবর্তী খলীফাদিগকে যিম্মিদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, নম্র আচরণ করা, প্রতিশ্রুতি পালন ও তাহাদের জান-মাল সংরক্ষণের জন্য লড়াই করা এবং তাহাদের উপর সামর্থ্যপেক্ষা অধিক দায়িত্ব-ভার অর্পণ না করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দান করিয়াছেন।

**যাকাত**

খিলাফতের আমলে মুসলমানদের সকল প্রকার সঞ্চিত ধন, গৃহপালিত পশু, নগদ সম্পদ ও জমির ফসলের উপর কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যাকাত ধার্য করা হইয়াছিল। এই যাকাত রীতিমত আদায় করা হইত এবং উহার প্রাপক আটটি শ্রেণীর মধ্যে উহা বণ্টন করা হইত।

**শুল্ক**

মুসলিম ব্যবসায়ীগণ যখন বিদেশে নিজেদের পণ্য রপ্তানি করিতেন, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে সেই দেশে এক দশমাংশ শুল্ক বাবদ আদায় করা হইত। হযরত উমর (রা) যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তিনিও ইসলামী রাজ্যে আমদানিকৃত পণ্যের

উপর অনুরূপ পরিমাণ শুল্ক ধার্য করার নির্দেশ দান করিলেন। এতদ্ব্যতীত যিম্মি ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিশভাগের একভাগ ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সমগ্র সম্পদের চল্লিশভাগের একভাগ আদায় করা হইত। তবে দুইশত দিরহামের কম মূল্যের সম্পদের উপর কিছুই ধার্য করা হইত না।

**মুদ্রা**

আরবদেশে ইসলামের পূর্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইরানী ও রোমীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল। নবী করীম (স) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত কালেও এই মুদ্রাই চালু ছিল। ইরান বিজয়ের পর হযরত উমর (রা) দিরহামের ওজন করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কেননা ইরানী মুদ্রায় ওজন বিভিন্ন প্রকারের হইত। মোট কথা খিলাফতে রাশেদার আমলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ বর্তমান ও কার্যকর ছিল এবং উহা কোন দিক দিয়াই পশ্চাদবর্তী ছিল না।

**জ্ঞানবিদ্যা**

কুরআন কারীম

ইসলামী চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হলো কুরআন কারীম। পরবর্তী যুগের এবং এই সম্প্রদায়ের জন্য মুসলমানরা যত যত জ্ঞানবিদ্যা আবিষ্কার করেছে, একাগ্র গবেষণার ফলেই কিতাব লিপিবদ্ধ করা হয়, তা এ কিতাবুল্লাহর।

মহানবী (সা.)-এর যুগেই কুরআন কারীমের আয়াত ও সূরাগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছিল। বেশ কিছু সাহাবির কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা মুখস্থ ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত বা বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) প্রতি বছর রমজান মাসে জিবরাঈলের উপস্থিতিতে পূর্ণ কুরআন কারীম পাঠ করতেন। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করবেন, সে বছর তিনি দুইবার পূর্ণ কুরআন কারীম আবৃত্তি করেন। সেই পাঠের সময় হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। তথ্যটি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় পুরো কুরআন শরীফ একইভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কারণ রাসুলের মৃত্যুর পর কুরআন যেন কোনোভাবে পরিবর্তিত না হয়, তাই ওহী ও কুরআন কারীমের

আয়াত ও সূরাগুলো সাহাবিদের কাছে খেজুরের ডাল, হাড় ও পাথরের টুকরোয় লিপিবদ্ধ ছিল।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সাহাবি শহীদ হন। তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, যদি হাফেজদের শহীদ হওয়ার ধারা এভাবে চলতে থাকে, তাহলে আমি আশঙ্কা করি কুরআন কারীম বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। অতএব, কুরআন কারীমকে এক পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হোক। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কিছুটা ইতস্তত করার পর তাঁর সাথে একমত হলেন। তিনি হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে ডেকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (রা.) নিজের স্মৃতিকে অন্যদের স্মৃতির সাথে যাচাই ও মহানবী (সা.)-এর যুগে লিপিবদ্ধ কাগজপত্রের সাথে তুলনা করার পর কুরআন মাজীদ এক পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করেন।

কুরআন মাজীদ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হলেও তার কপিগুলো খলিফাদের কাছেই অবশিষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন হযরত উসমান (রা.) ইবনে আসাফের ও ইবনে আবী-এর বর্ণনা অনুসারে এর বিস্তারিত ঘটনা নিম্নরূপ:

হিজরী ৩০ সালে আজারবাইজান ও বাবুল আবওয়াব জয়ের উপলক্ষে বিভিন্ন ইসলামী রাজ্য যেমন—মিসর ও ইরাকের সৈন্যরা একত্রিত হয়। এ সময় তাদের কুরআন পাঠে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মিসরীয়দের গঠন ভঙ্গি ছিল ভিন্ন, ইরাকিদের ভিন্ন; শামীদেরও ভিন্ন ছিল। গঠনরীতিতে বিভিন্নতার কারণে কেরাত বা পাঠরীতিতে খুব বড় পার্থক্য সৃষ্টি হলো। এমনকি তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলো এবং অন্য কেরাতকে ভুল বলে গণ্য করতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) খুব চিন্তিত হলেন। প্রথমে তিনি কুফায় কতিপয় নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সাথে আলোচনা করে তাঁদেরকে এ দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন করলেন। এরপর তাঁদের পরামর্শে তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে সকল বৃত্তান্ত হযরত উসমান (রা.)-কে জানালেন এবং বললেন, উম্মতের কল্যাণ চাইলে এ বিপদের বিহিত করুন। হযরত উসমান (রা.) সাহাবাদের কেরামকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন। সবার পরামর্শে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে সংকলিত কুরআন কারীমের কপি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে চেয়ে নিলেন এবং তার সাতটি কপি করে এক একটি কপি বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

এভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর সময়েই কুরআন কারীমের নির্ভরযোগ্য কপিগুলো বিভিন্ন দেশ ও শহরে প্রচারিত হয়ে যায় এবং আল্লাহর এ কিতাব আল্লাহর ওয়াদা-
"আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারী।"
অনুযায়ী সব ধরনের বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত হয়ে যায়। আল্লাহর এই লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত খুলাফায়ে রাশেদীন বা মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। সকল অধিকৃত ইসলামী দেশে কুরআনের তালিমের ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং ইবনে জাওযীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) মুয়াযযিন, ইমাম ও কুরআনের শিক্ষকদের জন্য সম্মানির ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, হযরত উমর (রা.) তাদের সুবিধাদানের ফল দাঁড়ালো এই যে, ইসলামী দেশগুলোর মসজিদগুলো মক্তবসমূহে আল্লাহর কালামের আওয়াজে গুঞ্জরিত থাকতো। শুধু শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন, সেখানে গোলমালে ব্যস্ত ছিলেন।

হাদীছ শরীফ

কুরআন কারীমের পরেই রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের মর্যাদা। হাদীস মূলত কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় মহানবী (সা.) হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তখন কুরআনের আয়াতসমূহের সাথে তা মিশে যেতে পারতো। মুসলিম শরিফের বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) বলেছিলেন,
"কেউ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।"
অবশ্য মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়।"
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সময়ে কুরআন কারীম লিপিবদ্ধ হতে থাকে এবং মৌখিকভাবে সাহাবায়ে কেরাম দূর-দূরান্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং যেখানে যান সেখানে নবুওয়াতী ইলম সাথে করে নিয়ে যান। শাম, মিসর, ইরাক প্রভৃতি বড় বড় শহরের বাসিন্দাদের পাঠদান কেন্দ্র গড়ে ওঠে। নও মুসলিমরা যারা ইসলামের আলো গ্রহণ করলেন, কিন্তু ইসলামী প্রবর্তকের বিশ্বজনীন সৌন্দর্য দর্শন করতে পারেননি এবং নতুন ইসলামী তত্ত্ব ও দর্শনে দীক্ষিত হলেন, তারা অতি আগ্রহের সাথে সকল ঐশী সুধী পুরুষদের নিজেদের আঁচলে পরিপূর্ণ করতে থাকলেন।

খিলাফতে রাশেদার যুগে হাদীসের প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে, লোকেরা একটি হাদীস শুনবার জন্য শত শত মাইল পথ সফর করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) একটি হাদীসের জন্য এক মাসের পথ সফর করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)-এর নিকট (শাম) গিয়েছিলেন। তেমনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-একটি হাদীস শুনবার জন্য এক দীর্ঘ সফর করেন। অপর এক মনীষী হযরত আবু দারদা (রা.)-এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনতে মদিনা থেকে দামেশক সফর করেছিলেন। জনৈক সাহাবী হযরত ফযালা ইবনে উবাইদ (রা.)-এর নিকট হাদীস শুনতে মিসর সফর করেছিলেন। আবুল আলিয়া বক্ষ্যমাণ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাদের কেরামের বরাতে কোন হাদীস শুনতাম। কিন্তু আমরা নিজেরা সফর করে স্বয়ং সে সাহাবীর নিকট থেকে সে হাদীসটি না শুনে ধৈর্য ধারণ করতে পারতাম না।
অধ্যায় পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করে হাদীসের কিতাবসমূহের সংকলন যদিও অনেক পরের যুগে হয়েছে, তথাপি এ যুগেও অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী আলেম নিজ নিজ হাদীস ভাণ্ডারকে সংকলনাকারে সংরক্ষণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা.) ও হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফিকাহ

কুরআন ও হাদীসের পরেই ফিকাহর স্থান। মহানবী (সা.)-এর সময়ের পরে যেসব নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কে ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে বিধি-বিধান আবিষ্কার করেন তা-ই ফিকাহ নামে পরিচিত। ফিকাহর মূল ইসলামী আইনের উৎসবিদদের মতে খিলাফতে রাশেদার খলিফারা ফকীহ ছিলেন। বিশেষ করে হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর ফিকহী দৃষ্টি ছিল অতি সূক্ষ্ম। তাছাড়া তাঁদের বিশেষ উপদেশের ফকীহ ছিলেন। কোন নতুন প্রশ্ন দেখা দিলে খুলাফায়ে রাশেদীন এ দলের সাথে পরামর্শ করে ফয়সালা করতেন, অতঃপর সে ফয়সালা সাধারণ ঘোষণা করা হতো। খুলাফায়ে রাশেদার বিভিন্ন সময়ে যে ভাষণ দান করতেন তাতেও প্রয়োজনীয় মাসায়েল বর্ণনা করতেন। এ সকল খুতবা যেহেতু বড় বড় সমাবেশে হতো, সে কারণে এ মাসআলাগুলো খুব প্রচার লাভ করতো। তাছাড়া

ফিকাহ শিক্ষাদানের জন্য অধিকৃত এলাকার বিভিন্ন খণ্ডে ফকীহ সাহাবাদের কেরামকে পাঠানো হতো। যেমন—হযরত উমর (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে কুফায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রা.) ও হযরত ইমরান ইবনে হুসাইনকে বসরায়, হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে মিসরে পাঠান। এ সকল মনীষীর ইলমী ধারায় হাজার হাজার ইলম পিপাসু তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং এভাবে কয়েকটি শহর ইসলামী ফিকাহর কেন্দ্রে রূপ নেয়।

অন্যান্য বিদ্যা

ইসলামের পূর্বে আরবে সাহিত্য ও কাব্যের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ ছিল। হযরত উমর (রা.) এ উৎসাহকে এর সঠিক স্থানে ব্যয় করেছেন। তিনি কুরআন শরীফ বুঝবার জন্য সাহিত্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে না সে যেন কুরআন শরীফ না পড়ায়।

হযরত উসমান (রা.) ও হযরত জায়দ ইবনে সাবিত (রা.) কুরআনের সুরাদের আলোকে 'ফরায়েজ'-কে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সংকলিত করেন। হযরত আলী (রা.) ইলমে নাহু আবিষ্কার করেন। তিনি এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ ভুল পড়তে শুনে চিন্তা করলেন যে, এমন বিদ্যা আবিষ্কার করতে হবে, যার সাহায্যে ই'রাব (বিভক্তি চিহ্ন)-এর ভুল পরিহার করা যায়। সেমতে আবুল আসওয়াদ দুয়ালীকে তিনি নিজে তত্ত্বাবধানে এ বিদ্যা সংকলনের নির্দেশ দিলেন।

এ সকল জ্ঞান বিদ্যা আবিষ্কার ও চর্চার ছাড়াও ধার্মিক শিক্ষা প্রসারের প্রতিও তারা যথেষ্ট মনোযোগ দেন। এজন্য যত মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারাও একাজ নেওয়া হয়। হীরা বিজয়ের পর সেখান থেকে একদল শিক্ষক আনা হয় এবং মদিনা মুনাওয়ারায় শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে তাদের নিযুক্ত করা হয়।

# শেষ কথা

ইসলামী নেতৃত্বের এই ধারণা কেবল কোনো প্রশাসনিক কাঠামো বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান আমানত। যা উম্মাহর ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্যন্ত সর্বত্র সুশৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও ঐক্য রক্ষার দায়িত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার হাতে যে শাসনব্যবস্থা সুসংহত হয়েছিল, তার মূল ভিত্তিই ছিল কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের কল্যাণ। পরবর্তী ইতিহাসে খলিফা, সুলতান, আমির বা বাদশা সহ নানা উপাধি ও ক্ষমতার রূপ বদলালেও একটি নীতি সর্বযুগে অপরিবর্তিত রয়েছে- এর প্রকৃত মর্যাদা অর্জিত হয় কেবল জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বিধান তথা শরীয়াহকে অগ্রাধিকার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আজকের যুগে মুসলিম উম্মাহ প্রত্যক্ষ খিলাফাহবিহীন থাকলেও আমরা হাদীসের মাধ্যমে জানি যে, নবীজি (সা.) ভবিষ্যতে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলে গেছেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, আজকের যুগে দুনিয়া জুড়ে মানবরচিত বিধানের যে জুলুম ও অন্ধকার বিরাজমান, তার অবসান ঘটিয়ে শেষ জমানায় আবার ফিরে আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। এটি হবে মূলত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রকাশ।

তাই খিলাফাহর মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের আত্মশুদ্ধি ও আমলের দিকটিকে কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না। ইতিহাসের প্রতিটি সফল নেতৃত্বের পেছনে ব্যক্তিগত নৈতিক দৃঢ়তা ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিই ছিল মূল মৌলিক ভিত্তি। কেবল বাহ্যিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করলেই খিলাফাহর লক্ষ্য পূর্ণ হয় না; ইনসাফ, হিদায়াত ও আমানতের চেতনাকে ব্যক্তি, সমাজ ও নেতৃত্বে সমানভাবে ধারণ করতে হয়।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা আমাদের এই সত্যের দিকেই নিয়ে যায় যে, খিলাফাহ কোনো বন্ধ অধ্যায় নয়। এটি ন্যায় ও আমানতের এক অবিরাম আহ্বান, যা উম্মাহকে উপযুক্ত সময়ে নতুনভাবে আলোকিত করতে পারে।

অতএব, খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শকে বুঝে এর মর্মকথা ধারণ করা কেবল অতীতের কোনো স্মারক নয়; বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের নেতৃত্ব ও সামাজিক কাঠামোতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এক শাশ্বত পথপ্রদর্শক। আল্লাহর বিধানকে জীবন ও সমাজে

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, উম্মাহর ঐক্য ও কল্যাণ রক্ষার আন্তরিকতা এবং ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি ও ইখলাসের সমন্বয়-এসবই খিলাফাহর প্রকৃত রূপের আসল প্রাণ।